শিশুর মন

শ্রীসুবোধ লাল ব্রহ্মচারী

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

বিদ্যার বহুবিস্তীর্ণ ধারার সহিত শিক্ষিত-মনের যোগসাধন করিয়া দিবার জন্য ইংরেজিতে বহু গ্রন্থমালা রচিত হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু বাংলা ভাষায় এ-রকম বই বেশি নাই যাহার সাহায্যে অনায়াসে কেহ জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের সহিত পরিচিত হইতে পারেন।

যুগশিক্ষার সহিত সাধারণ-মনের যোগসাধন বর্তমান যুগের একটি প্রধান কর্তব্য। বাংলা সাহিত্যকেও এই কর্তব্যপালনে পরাঙ্মুখ হইলে চলিবে না। তাই এই দুর্যোগের মধ্যেও বিশ্বভারতী এই দায়িত্বগ্রহণে ব্রতী হইয়াছেন।

॥ ১৩৫২ ॥

৩৭. হিন্দু সংগীত : শ্রীপ্রমথ চৌধুরী ও ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী
৩৮. প্রাচীন ভারতের সংগীত-চিন্তা : শ্রীঅমিয়নাথ সান্যাল
৩৯. কীর্তন : শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র
৪০. বিশ্বের ইতিকথা : সুশোভন দত্ত
৪১. ভারতীয় সাধনার ঐক্য : ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত
৪২. বাংলার সাধনা : শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী
৪৩. বাঙালী হিন্দুর বর্ণভেদ : ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়
৪৪. মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী : ডক্টর সুকুমার সেন
৪৫. নব্যবিজ্ঞানে অনির্দেশ্যবাদ : শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত
৪৬. প্রাচীন ভারতের নাট্যকলা : ডক্টর মনোমোহন ঘোষ
৪৭. সংস্কৃত সাহিত্যের কথা : শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী
৪৮. অভিব্যক্তি : শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ ১৩৫৩ ॥

৪৯. হিন্দু জ্যোতির্বিদ্যা : ডক্টর সুকুমাররঞ্জন দাশ
৫০. ন্যায়দর্শন : শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য
৫১. আমাদের অদৃশ্য শত্রু : ডক্টর ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৫২. গ্রীক দর্শন : শ্রীশুভব্রত রায় চৌধুরী
৫৩. আধুনিক চীন : থান য়ুন শান
৫৪. প্রাচীন বাংলার গৌরব : মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
৫৫. নভোরশ্মি : ডক্টর সুকুমারচন্দ্র সরকার
৫৬. আধুনিক য়ুরোপীয় দর্শন : শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
৫৭. ভারতের বনৌষধি : ডক্টর শ্রীমতী অসীমা চট্টোপাধ্যায়
৫৮. উপনিষদ্ : মহামহোপাধ্যায় শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী
৫৯. শিশুর মন : শ্রীসুখেনলাল ব্রহ্মচারী

শিশুর মন

শ্রীসুখেনলাল ব্রহ্মচারী

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
কলিকাতা

শ্রদ্ধেয় শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের করকমলে

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি সমর্পিত হইল।

ফাল্গুন ১৩৫৩

মূল্য আট আনা

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী, ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা
মুদ্রাকর শ্রীঅজিতকুমার বসু
শক্তি প্রেস, ২৭।৩ বি, হরি ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা

লোকদের মন বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে ঐসব রোগের মূল তাহাদের শৈশব-জীবনে। ডাক্তার ফ্রয়েড (Freud) এই সম্পর্কে যুগান্তকারী আবিষ্কার করিয়াছেন।

শিক্ষাক্ষেত্রে আজ নানাপ্রকারের পদ্ধতির আবির্ভাব হইয়াছে। কারণ, মনোবিদ্‌গণ যে সত্যের উন্মোচন করিয়াছেন তাহার আলোকে দেখা যায় যে ঠিক প্রণালীতে মনকে নিয়ন্ত্রণ করিতে না পারিলে শিক্ষাদানের নামে অনেক শক্তির অপচয় হয়, লাভ কিছুই হয় না। আর, পুরাতন গতানুগতিক ভয় দেখাইয়া শিখানোর প্রণালী ছাড়া ভালো উপায় কি কিছু নাই? লেখাপড়া শিখিতে হইলে কি মাস্টার মহাশয়ের মার খাইতেই হইবে এবং স্কুলে যাইবার কথায় শিশুদের হৃৎকম্প উপস্থিত হইবে? হাসিমুখে কি বিদ্যালাভ করা যায় না? ইহা ছাড়া শুধু বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশেই শিক্ষা শেষ হয় না, সমগ্র ব্যক্তিত্বকে পরিস্ফুট করিতে হইবে। শিশুকাল হইতেই শিক্ষা আরম্ভ হইবে নানাপ্রকার সৃজনমূলক কাজের মধ্য দিয়া।

সামাজিক কুসংস্কার দূর করিতে হইলেও শিশুদের [illegible] মানুষ করা দরকার। শিশু জাতিভেদ বোঝে না, বারো মাসে তেরো পার্বণ বোঝে না, ধর্মের আচার-অনুষ্ঠান বোঝে না, আমরা যাহা বুঝাই তাহাই বোঝে। একবার যখন তাহার মনে অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার প্রবেশ করে, তখন উহা মনের মধ্যে গাঁথা হইয়া যায়, পরে কোনো প্রকার বক্তৃতা দিয়াই তাহা দূর করা যায় না। এই জন্যই সমাজ বা রাষ্ট্রগঠনের ব্যাপারেও শিশুকাল হইতে কাজ শুরু করিতে হইবে।

এ কাজ খুব সহজ নয়; গৃহে, বিদ্যালয়ে, সর্বত্র অভিভাবকদের বিচক্ষণতা ও সহিষ্ণুতার সহিত শিশুকে বিকাশ লাভের সুযোগ দিতে হইবে, শিশুর মনকে জানিতে হইবে।

শিশুমনের অভিব্যক্তি

বুদ্ধি ও চিন্তার ধারা

শিশুদের কথাবার্তা শুনিলে এবং ক্রিয়াকলাপ দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে উহারা প্রাণী ও অপ্রাণীর তফাত খুব ভালো করিয়া বোঝে না। চেয়ার-টেবিলের সঙ্গেই হয়তো কথাবার্তা বলিয়া চলিয়াছে। একটি পুতুলকে বলিয়া বসিল, "তোর মাকে বলিস, ভালো জামা কিনে দেবে।" মাটিতে আছাড় খাইয়া পড়িয়া গেল, উঠিয়া মাটিকে ঘা কয়েক লাগাইয়া চীৎকার করিয়া বলিল, "আর করবি? আমাকে ফেলবি?" সূর্য আকাশে উঠে, অর্থাৎ বাড়ি হইতে ভালো করিয়া খাইয়া-দাইয়া আকাশে ঘুরিয়া বেড়ায়। চাঁদ, তারা ইত্যাদি যখন যেমন খুশি চলাফেরা করিতে পারে, ইত্যাদি।

শুধু তাই নয়, শিশুর ধারণা—সব কিছুই মানুষের মতো; অর্থাৎ সব প্রাণী—পোকামাকড়, বাঘ, হাতী, গণ্ডার ইত্যাদি এবং সর্ববিধ বস্তু—থালা, গ্লাস, ঘটি, বাটি, দেশলাই, বই, জল, মেঘ, আকাশ মানুষের মতো জীবন যাপন করে। অর্থাৎ শিশু ভাবে, "আমি যেমন ভাবি, যেমন করি, যেমন দেখি, ওরাও তাই ভাবে, তাই করে এবং তাই দেখে।" শিশু প্রাকৃতিক নিয়ম বুঝিতে পারে না। তার বুদ্ধি তখনও সৃষ্টির বৈচিত্র্য বিশ্লেষণ করিতে পটু হয় নাই।

আর একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, শিশুরা মনে করে তাহারা যাহা ভাবিবে তাহাই হইবে, হইতে বাধ্য। যেমন, সে যদি বলে, "রেলগাড়ি থামো" অমনি রেলগাড়ি থামিবে। বড়াই করিয়া মাকে বলিবে, "জানো, আমি মোটর থামাতে পারি, বৃষ্টি নামাতে পারি, রোদ উঠাতে পারি।" যদি ক্রমশ সে দেখে যে তার ইচ্ছায় বিশেষ কিছুই হয় না এবং তাহার দম্ভের কোনো অর্থ হয় না, তখন সে বড়ো দুঃখ পায়।

শিশু তাহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে ক্রমশ বুঝিতে পারে যে বস্তুসমূহ তাহাদের স্বভাবানুযায়ী চলে।

শিশুদের যদি প্রশ্ন করা যায়, "তোমরা কিসের গল্প শুনিবে?" সমস্বরে উত্তর হইবে "ভূত, ডাকাত, রাক্ষসের।" সর্বত্রই ছেলেপিলেদের ভূত-প্রেত-দৈত্য-রাক্ষস ইত্যাদি সম্পর্কে অপূর্ব কৌতূহল। শিশুমনের সঙ্গে বর্বর জাতির মনোবৃত্তির বিশেষ সাদৃশ্য আছে। বর্বরদের মানসিক শক্তি খুব বেশি বিকাশলাভ করে নাই, অনেকটা শিশুরই ন্যায়। ইভলিউশন (Evolution) মতানুযায়ী ইহাই দেখা যায় যে আমরা যখন সহস্র সহস্র বৎসর পূর্বে আদিম অধিবাসীদের ন্যায় ছিলাম, তখন তাহাদের সেই মনোবৃত্তি আমাদেরই শিশু-মনের ভিতর জাগ্রত হইতেছে। যাহা মনুষ্যজাতির ভিতর ক্রমাবর্তনের সময় সংঘটিত হইয়াছিল তাহা একটি মানুষের জীবনেও ঘটিতে বাধ্য। অর্থাৎ, আদিম মানব প্রকৃতির নিয়ম বুঝিত না, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি তাহার ছিল না, কাল্পনিক বিশ্বাসে তাহার মন পূর্ণ ছিল। ক্রমে অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধি চালনার দ্বারা আমাদের পূর্বপুরুষগণ প্রকৃতির নিয়ম আবিষ্কার করিতে লাগিলেন—কল্পনার স্থানে যুক্তি আসিল, তাঁহাদের চিন্তার ধারা শৃঙ্খলাবদ্ধ হইতে লাগিল। এখন মানবজাতির জীবনে যাহা হইয়াছে, একটি মনুষ্যবিশেষের জীবনেও তাহা হয় বলিয়া মনে হয়। যেমন, শিশু প্রথমত এলোমেলো চিন্তা করে, ভূত-প্রেত-ডাকিনীতে বিশ্বাস করে, পরে সে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে সমস্ত কিছু দেখিতে থাকে। এইরূপে আদিম মানবের মনের বিকাশ যে পর্যায়ে হইয়াছিল তাহারও মনের বিকাশ সেইভাবে হয়।

মোটামুটি কথা এই যে, ছেলেপিলেরা প্রথমে যে চিন্তা করে তাহাতে যুক্তি থাকে না, বিশ্লেষণ বা বিচার থাকে না। কল্পনাই তাহাদের কাছে বাস্তব ; ভূতপ্রেত, তেপান্তরের মাঠ, রূপকথার রাজপুত্র, ক্ষীরসাগর,

ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী সবই সত্য। পরে তাহাদের মন যখন সব তলাইয়া দেখে, বিচার করে এবং যখন তাহাদের ধারণাশক্তি বাড়ে, তখন আর উহার সেরকম ভালো লাগে না।

কথাবার্তা ছেলেরা জন্মিয়াই কোনো যাদুমন্ত্রে শিখে না। তাহারা প্রতি বস্তুর কার্যকলাপ লক্ষ্য করে এবং তদনুসারে তাহার একটা নাম দেয়। যেমন, বিড়াল দেখিয়া বলিল 'ম্যাও' আসিয়াছে। মোটরগাড়ি দেখিয়া বলিল 'পাম পাম'।

কোনো বস্তুর সহিত কোনো নাম বিজড়িত থাকিলে উহাদের শিখিতে সুবিধা হয়। যেমন এক বাটি দুধ শিশুর সামনে রাখিয়া বলিলাম—দুধ। শিশু দেখিল একটি সাদা তরল পদার্থ, পান করিয়া জিনিসটির স্বাদ বুঝিল। পরে 'দুধ' শব্দটি শুনিলেই উহার মনে ভাসিয়া উঠিবে উহার রূপ ও স্বাদ; সাদা তরল জিনিস দেখিলেই বলিবে 'দুধ'।

পাড়াপড়শী, মা, বাবা, কাকা, জ্যেঠা ইত্যাদির নিকট ক্রমাগত কথা শুনিতে শুনিতেও শিশুর শব্দশিক্ষা হয়। কোনো বাঙালী শিশু যদি রাশিয়ান বা জাপানী পরিবার ও সমাজে মানুষ হয় তবে সে রাশিয়ান বা জাপানী ভাষাই শিখিবে। অনেকে ভাবেন যে ইংরেজ-সন্তানের রক্তের মধ্যেই বুঝি ইংরেজী ভাষা আছে, বাঙালী-সন্তানের রক্তেই বাংলা ভাষা আছে। ইহা ভুল। রক্তে ভাষা থাকে না। ভাষা থাকে পরিবার ও সমাজে, যাহার মধ্যে সে বাস করে। একজন স্টেশনমাস্টারকে জানিতাম, তিনি পার্বত্য অঞ্চলে এক রেলওয়ে স্টেশনে কাজ করিতেন। তাঁহার একটি সন্তান কথা শুনিবার বা বলিবার বিশেষ সুযোগ পায় নাই। কারণ, তিনি বিপত্নীক, নিজে কাজে ব্যস্ত, আশে-পাশে লোকের অভাব। এই সন্তানটিকে সকলে বোবা মনে করিত, তাহার মুখে কথা নাই। বিশ্লেষণ করিয়া দেখা গেল কথা শোনার সুযোগ না পাইয়াই ছেলেটির অবস্থা এইরূপ।

ছেলেপিলেরা কোনো একটি নির্দিষ্ট বস্তু এবং বস্তুর শ্রেণী বুঝিতে পারে না। নিজের বাবাকে জানে—রাস্তা দিয়া যে কোনো মানুষকে দেখিয়া হয়তো বলিবে 'বাবা, বাবা'। স্ত্রীলোক দেখিলেই অনেক সময় 'মা' বলে। বিড়াল দেখিলেই 'পুষি' বলে। অর্থাৎ একটি জাতিকে নিজেদের পরিচিত একটি উদাহরণ দিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করে। সমস্ত গাছ 'আম গাছ', সমস্ত কুকুর 'বাঘা'। ক্রমশ এই ভুল ভাঙিয়া যায় এবং জাতিবাচক শব্দের তাৎপর্য বুঝিতে পারে।

শিশুর বুদ্ধি সম্বন্ধে আরও কয়েকটি কথা বিশেষ করিয়া জানিবার আছে। জন্মিয়াই কেহ প্রখর বুদ্ধির পরিচয় দেয় না। আস্তে আস্তে বুদ্ধিবৃত্তি পরিস্ফুট হয়। সকলের বুদ্ধি কি সমান? মনোবিদগণ বলেন, মানুষ একটি নির্দিষ্ট বুদ্ধির মাত্রা লইয়া জন্মায়, তাহার বেশি সে আয়ত্ত করিতে পারে না। বৈজ্ঞানিক উপায়ে বুদ্ধি মাপিবার চেষ্টাও হইয়াছে। নানা প্রকারের মান বা টেস্ট (test) আছে। বিভিন্ন বয়সের বিভিন্ন টেস্ট। এই পরীক্ষা-মানের দ্বারা বুঝা যায় কোন্ শিশুর কতটা সাধারণ বুদ্ধি, অর্থাৎ কে কতটা ধারণা, পর্যবেক্ষণ, বিচার, স্মরণ ও বিশ্লেষণ ইত্যাদি করিতে পারে। দেখা গিয়াছে যে এই জন্মগত বুদ্ধিশক্তি যতটা বাড়িবার তাহা ষোলো বা বড়ো জোর আঠারো বৎসরের ভিতরই বাড়িয়া ক্ষান্ত হয়। এই বয়সের পর বুদ্ধি-শক্তি আর বাড়ে না।

একটি শিশুকে পরীক্ষা করিয়া তাহার বুদ্ধি নির্ণয় করা হইল। এখন কতটা তাহার বুদ্ধির মাত্রা বলিতে হইবে? Intelligence Quotient (সংক্ষেপে) I. Q. দ্বারা তাহা বুঝানো যায়। কাহারও আই. কিউ. (I. Q.) ১০০, কাহারও বা ১২০, কাহারও বা ৯০ কি ৬০। ১০০ আই. কিউ. হইলে বুঝিতে হইবে মোটামুটি চলনসই বুদ্ধি আছে, ইহার যত বেশি আই. কিউ. হইবে বুদ্ধি তত বেশি আছে ধরিয়া লইতে

হইবে ; আর ১০০ আই. কিউ. অপেক্ষা যত কম হয় মূর্খতার মাত্রা তত বেশি বুঝিতে হইবে।

কিন্তু একটি ভুল করিলে চলিবে না। বুদ্ধি এবং বুদ্ধির প্রয়োগ এক জিনিস নয়। আমার আই. কিউ. ১২০ ; কিন্তু খাটিব না, পড়িব না, আড্ডা গল্প করিয়া বেড়াইব, আমার লেখাপড়া হইবে কি করিয়া ? অপর একটি বালকের আই. কিউ. মাত্র ১০০, কিন্তু সে খুব পরিশ্রমী, সে বেশি কৃতকার্য হইবে। মনোবিদ্‌রা বলেন যে আই. কিউ. যাহা বাড়িবার তাহা ১৬-১৮ বৎসরের ভিতরই বাড়িবে ; কিন্তু তাঁহারা তো এ কথা বলেন না যে পরিশ্রম করার ক্ষমতা বা ইচ্ছাশক্তিও ঐ বয়সেই চরম সীমায় আসিয়া যায়। যত বেশি বুদ্ধি লইয়া জন্মগ্রহণ করি ততই ভালো, কিন্তু শুধু তাহার উপরই বড় হওয়া নির্ভর করে না। কৃতকার্য হইতে গেলে মোটামুটি বুদ্ধি ও তৎসহ মনের বল, সংকল্প ইত্যাদি থাকা চাই। আই. কিউ. খুব বেশি নয় বলিয়া কাহারও হতাশ হওয়ার কারণ নাই। অবশ্য অত্যন্ত কম আই. কিউ. হইলে বড় কিছু করা সম্ভব নয়। কারণ যে কোনো কাজ করিতে গেলেই বুদ্ধির প্রয়োগ চাই। সুতরাং সাধারণ মাত্রার বুদ্ধি অবশ্যচাই। তৎসহ প্রয়োজন তাহাকে চালনা করিবার মনোবল।

বড়দের ভিতর যেমন এক এক ব্যক্তির এক এক রকমের প্রতিভা থাকে, শিশুদের ভিতরও তেমনি লক্ষ্য করা যায়। একটু বড় হইলেই দেখা যায় একটি ছেলে গান খুব ভালোবাসে, আর-একটি কলকব্জা লইয়া কাজ করিতে ভালোবাসে। একটি অঙ্ক পছন্দ করে, আর-একটি তাহা করে না, তবে সাহিত্য ভালোবাসে। কাহার কোন্ দিকে বিশেষ প্রতিভা আছে, তাহার উপর জীবনের সাফল্য ও প্রতিষ্ঠা অনেক নির্ভর করে ; শৈশবেই যাহার যে-দিকে প্রতিভা, তাহার আভাস পাওয়া যায় এবং

বর্তমানে তাহা নির্ণয় করিবার বহু টেস্ট্ বা পরীক্ষার উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে।

মোটামুটি কথা এই যে, শিশুর মন ক্রমশ যুক্তি, বিচার করিতে শিখে, তাহার চিন্তার ধারা সুশৃঙ্খলগতিতে চলিতে থাকে এবং বিশেষ বিশেষ দিকে তাহার মনের ক্ষমতা ফুটিয়া উঠিতে থাকে।

নীতিজ্ঞান ও সামাজিক আদর্শগ্রহণ

অনেকে মনে করেন যে, ছেলেপিলেরা 'দেবশিশু' অর্থাৎ তাহারা সরল, দেবতার ন্যায় মহৎ, হিংসা-দ্বেষ তাহাদের নাই। আমাদের মতন পাষণ্ডদের পাল্লায় পড়িয়া ক্রমে তাহারা চালাকি শিখে এবং নষ্ট হইয়া যায়। এই প্রকারের ধারণা যে কত ভুল তাহা আমরা একটু বিশ্লেষণ করিলেই বুঝিব। কোনো ছেলের একটি পুতুল বা এক টুকরা কাঠ—যাহা তাহার সম্পত্তি—স্পর্শ করিলেই সে চীৎকার করিয়া উঠিবে, নয়তো মারিতে আসিবে পাছে তার জিনিস বেদখল হইয়া যায়। হাতে কয়েকখানি বিস্কুট রহিয়াছে—বলিলাম, "দাও না আমায় একখানা।" হাত বাড়াইয়াছি বিস্কুট পাইবার আশায়—হঠাৎ দেবশিশু এমন দংশন করিলেন যে আদিমযুগের নরখাদকদের কথা মনে পড়িয়া গেল।

জন্মিবার পরক্ষণেই কেহ বুদ্ধ বা চৈতন্য হয় না। অথবা আমরাই যে তাহাদের নষ্ট করিয়া দিই এ কথাও বলা চলে না। আসল কথা হইতেছে এই যে, শিশু নীতিজ্ঞান লইয়া জন্মে না। কোন্‌টা ভালো বা কোন্‌টা মন্দ এ-রকম কোনো বিচার তাহার থাকে না। একটু বয়স হইলেই যখন তাহার বোধশক্তি বাড়িতে থাকে তখন সে দেখে যে কতকগুলি কাজ তাহার বাবা মা পছন্দ করেন, আর কতকগুলি অপছন্দ করেন। যেমন একটি নবাগত অতিথির গায়ে চিমটি কাটিলে অভিভাবক শাস্তি দেন, আবার পড়াশুনা করিলে বাড়ির লোকেরা বেশ

খুশি হন। বাবার পকেট হইতে সিকি আধুলি গোপনে বাহির করিয়া চীনাবাদাম খাইলে তিনি চটেন, কিন্তু তাঁহার হারানো চশমা বাহির করিয়া দিলে তিনি খুশি হন। সকাল হইল, একটি ছোট ছেলে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, একবার চৌবাচ্চার জল ফেলিতেছে, একবার রান্নাঘরে আনাগোনা করিতেছে, একবার 'মিটসেফে'র জালের ভিতর দিয়া লুব্ধ নয়নে বন্দীকৃত ক্ষীর পায়েস ইত্যাদি দেখিতেছে। তখন মা বলিলেন, "যাও, বই পড়ো, ভালো ছেলেরা সকালবেলা পড়ে। শিশু ক্রমাগত শুনিতে পায় ভালো ছেলেরা মিথ্যা কথা বলে না, মায়ের কথা শোনে, যেখানকার জিনিস সেখানে রাখে, চুরি করে না, খাওয়ার সময় 'এটা দাও, সেটা দাও' বলে না। অর্থাৎ ভালো ছেলে হইতে গেলে যাহা যাহা করা দরকার তাহা তাহাকে বার বার বলা হইল। শিশু দেখে যে ভালো ছেলের মতো কাজ করিলে সুবিধা অনেক। লোকের প্রশংসা পাওয়া যায়, কানমলা খাওয়ার মাত্রা কমিয়া যায়। পুরস্কারস্বরূপ জামা-কাপড়, ভালো খাবার জিনিস পাওয়া যায়। আর মন্দ ছেলের মতন কাজকর্ম করিলে পেটে পিঠে উভয়ত কষ্ট পাইতে হইবে। স্কুলেও মাস্টার মহাশয় বলেন ভালো ছেলে হইতে। মন্দ ছেলের কি পরিণাম তাহাও সে দেখে। সর্বত্রই যেখানে সে যায় সেখানেই দেখে 'ভালো ছেলে'র আদর, আর 'মন্দ ছেলে'র অনাদর।

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে এবং বাবা মা ও সমাজের অনুশাসন হইতে সে চেষ্টা করে ভালো ছেলে হইতে। ক্রমে সে ঐ সমস্ত অনুশাসন অন্তরস্থ করিয়া ফেলে—অর্থাৎ, নিজেই যেন নিজের নৈতিক শিক্ষক হইয়া দাঁড়ায়। যেমন, পরীক্ষার ঘরে নকল করিবার সুযোগ রহিয়াছে; একবার মনে হয় নকল করি, আবার তৎক্ষণাৎ নিজে নিজে ভাবি, "ছি, তুমি এ কি করিতেছ? না, না, নকল করা উচিত নয়।" মা ঘুমাইয়া আছেন, একবার তীব্র ইচ্ছা হইল, আঁচল হইতে চাবি লইয়া 'মিটসেফ'

খুলিয়া কিছু সরানো যাক, তৎক্ষণাৎ কে যেন ভিতর হইতে বলিল, 'চুরি ক'রে খাওয়া কি ঠিক হবে?' আমরা দেখিতে পাই, প্রথমে যে-সব নীতিমূলক কথা বাবা মা দাদা দিদি শিক্ষক পুনঃ পুনঃ বলিতেন, তাহা পরে শিশুর মনে এমনভাবে গ্রথিত হয় যেন ঐগুলি শিশুরই নিজস্ব বৃত্তি। তখন এমন অবস্থা হয় যে সে তার ছোট ভাইবোনদের শাসায়, "কাঁদিস্ না, কাঁদলে বিস্কুট পাবি না", "চুরি ক'রে খাস না", "মিছে কথা বললে নরকে যাবি", "পড়াশুনো না করলে কপালে দুঃখু আছে।" এই যে শিশুর নীতিজ্ঞান বা বিবেক তাহাকে ফ্রয়েড নাম দিয়াছেন—সুপার ইগো (Super Ego) বা 'বড় আমি'। অর্থাৎ আমাকে কি করিতে হইবে, কি ভাবে চলিতে হইবে ইত্যাদি যে সমঝাইয়া বা নির্দেশ করিয়া দেয় সেই 'বড় আমি'।

শিশুদের বিবেক শৈশবেই গড়িয়া উঠে। যে যেমন পরিবারে বা সমাজে বাস করে তাহার নীতিজ্ঞানও তেমনি হয়। সাঁওতাল ছেলে শুনিয়াছে 'ভালো ছেলেরা চাষবাস করে, গরু চরায়, ভূতপ্রেত বিশ্বাস করে। তাই লেখাপড়া না জানিলে উহাদের ছেলেরা মন্দ হয় না। আবার ভদ্রসমাজে লেখাপড়া না জানিলে 'বদ ছেলে' বলিতে হয়। অনেক পরিবারে বাপ মা ছেলেদের এক-আধটুকু চুরি বা পাঠে অনভ্যাস ইত্যাদি লইয়া মাথা ঘামান না। তার ফলে ঐসব ছেলের ভালো পথে যাইবার সম্ভাবনা কমিয়া যায়। কারণ, বাপ-মায়ের তাচ্ছিল্যে 'সুপার ইগো' সুগঠিত হয় নাই। ভালো শিক্ষা ও পরিচালনার ফলে শিশুদের ভালোমন্দ বিচার করিবার ক্ষমতা বাড়িয়া যায় এবং নীতিজ্ঞান সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, পরে নৈতিক আদর্শের জন্য তাহারা সর্বপ্রকার কষ্ট বরণ এবং সমাজের উন্নতি সাধন করিতে পারে।

শিশুরা কি আজন্মই খুব মিশুক? একটি ছেলে কি অন্য ছেলেদের সঙ্গে আপনা হইতেই মিশে এবং দলসৃষ্টি করে? অনেকের ধারণা,

ছেলেরা ছেলেদের সঙ্গে তো মিশিবেই। শিশুদের পর্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায়, প্রথম দিকটাতে তাহারা অত্যন্ত স্ব-প্রধান থাকিতে চায়। দুই-তিনটিতে খেলিতে আরম্ভ করিল। কেহ বলিল, "রাঁধা-বাড়া খেলব", কেহ বলিল, "হা-ডু-ডু-ডু খেলব"। কাহারও কথা কেহ শুনিবে না, তাহার পর হয়তো দেখা গেল, তিনটি মাথার চুলে ছয়টি হাতে আকর্ষণ-বিকর্ষণ-লীলা চলিতেছে।

শিশুরা সাধারণত অত্যন্ত অবিনীত এবং অহংকারী থাকে এই রকম কথা সর্বদা শোনা যায়, "জানিস, আমার বই তোর থেকে ভালো?" "তোর জুতো বিশ্রী, আমার জুতো চমৎকার", "তোর থেকে আমার গায়ে জোর বেশি, আয় না একবার লড়তে।" একটি শিশু অন্য একটিকে দেখিলে প্রথমেই ভাবে, কে বড়ো, কার কত বেশি পুতুল আছে, কার জামা কত সুন্দর! আড়াআড়ি ভাবটা খুব ভালো ভাবেই ধরা পড়ে। কোনো একটা কৃতিত্বের কাজ করিয়া আসিয়া আত্মতৃপ্তি লাভ করে এই বলিয়া—"মা, ও বাড়ির পটলা আমার মতন এ-কাজ পারবে?" জর হইয়াছে, মা বলিলেন, "ভাত আজ পাবে না, তুমি তো ভালো ছেলে, যাও, শুয়ে থাকগে।" অমনি সে বলিবে, "দেখ মা, পটলা এমন পাজি, জরগায়ে ভাত খায় লুকিয়ে, আমি ওর চেয়ে অনেক ভালো, না?" এই প্রতিদ্বন্দ্বী ভাব শিশুদের প্রথম বয়সে খুব থাকে।

তারপর বড় হইতে থাকিলে সে দেখে স্কুলে কত ছেলে। তাহাদের সঙ্গে মানাইয়া চলিতে হইবে—বেশি রাগারাগি করিলে বা হুমকি দিলে তাহারা বয়কট করিবে, খেলায় লইবে না। বিদ্যালয়ে নানা পরিবার হইতে নানা প্রকারের ছেলেপিলে আসে। নীচের ক্লাসে মাস্টার মহাশয় "স্যার, দেখুন, সমীর আমার বই নিয়ে গেল", "স্যার, নরেশ আমাকে ভ্যাংচাচ্ছে" এই রকম অভিযোগ শুনিতে শুনিতে বিরক্ত হইয়া যান।

ক্রমশ একত্র থাকিতে থাকিতে এবং ঝগড়ার তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলে তাহাদের মধ্যে অনেকটা একতা আসে। উচ্চ শ্রেণীর ছেলেদের ভিতর ঝগড়া কম ইহা সকলেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। ঝগড়ার ফল সুখপ্রদ নয়। কারণ অনেক মাস্টার বা অভিভাবক কোনো নালিশ শুনিলে দুই পক্ষকেই শাস্তি দেন। এ তো হইল উপরওয়ালাদের বিচার—তা ছাড়া নিজেদের ভিতরও বেশ দু-চার ঘা দেওয়া ও খাওয়া চলে।

এ ছাড়া, অনেক খেলা আছে যা একা খেলা যায় না। ভালো ভালো খেলা প্রায়ই অনেকে মিশিয়া খেলে। তাহাতে সদ্ভাব থাকার প্রয়োজন। কাজেই মিল করিয়া চলিতেই হইবে। স্কুলে, সভা-সমিতিতে, বাড়িতে, খেলার মাঠে—সর্বত্রই একতা এবং সদ্ভাবের প্রয়োজন। সংঘবদ্ধ হইয়া কাজ করিতে বড়োরা সব সময়ই পরামর্শ দেন এবং অনেক সময়ে জোর করিয়া করাইয়া নেন। এইভাবে প্রয়োজনের খাতিরে মিল করিয়া সবার সঙ্গে কাজ করিতে হয় এবং 'সংঘ-মনে'র (Group Mind) উদ্ভব হয়। ফলত স্ব-প্রাধান্য লোপ পায়, বা ভিতরে ভিতরে চাপিয়া রাখিতে হয়। কারণ তাহা না করিলে সবাই শাস্তি দিবে এবং একা একা থাকিতে হইবে। 'বয়কট' জিনিসটি যে ছেলেদের কাছে কি ভয়ংকর তাহা সবাই জানেন।

শিশুরা প্রথমে আত্ম-প্রধান (Ego centric) থাকে। ক্রমশ পর-প্রধান বা সমাজ-অভিমুখী (Socio centric) হইতে থাকে। কেহ যেন মনে না করেন যে এই পরিবর্তন আপনা আপনি হয়। রীতিমত শিক্ষা দিয়া ছেলেদের মিশুক করাইতে হয়। উহারা যখন দেখে যে নিঃসঙ্গ থাকিলে অশেষ কষ্ট, সবার সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া থাকা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, তখনই সমাজানুরাগী হয়।

খেলাধুলা

শিশুরা খেলিতে ভালোবাসে, কতরকম খেলা তাহারা খেলে তাহার

ইয়ত্তা নাই। কেন যে শিশুরা খেলে, খেলার ভিতর শিশুমনের কি অভিব্যক্তি, তাহা একটু বিশ্লেষণ করা উচিত। মনোবৈজ্ঞানিকগণ অনেক যত্নসহকারে শিশুদের খেলার ধরনধারণ পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন। এক-এক জন এক-এক মত প্রকাশ করিয়াছেন।

ছেলেপিলেরা মাটি কাদা ইত্যাদি জিনিস লইয়া খেলিতে ভালোবাসে, পশুপক্ষী ইত্যাদি লইয়া তাহারা মত্ত হইয়া খেলাধুলা করে। ইহাতে মনে হয় আমাদের পূর্ববর্তী আদিম অধিবাসীদের জীবনযাত্রা-প্রণালীর পুনরভিনয় চলিতেছে।

অনেকে ভাবেন, তা নয়, শিশুদের খেলাতে ঐ প্রকারের কোনো গূঢ় রহস্য নাই। ছেলেদের শরীর যখন ভালো থাকে, মন প্রফুল্ল থাকে তখন মানসিক শক্তির প্রাচুর্যবশত তাহারা যাহা পায় তাহাই লইয়া খেলে। শিশু অসুস্থ বা মনে মনে অসন্তুষ্ট থাকিলে খেলাধুলা করে না। যখন ভিতরে আনন্দের আবেগ আর ধরে না, মন উচ্ছ্বসিত হয়, তখনই খেলার দিকে তাহার মন যায়।

কিন্তু শুধু মনের উচ্ছ্বাসই খেলাধুলার কারণ এ কথা সঠিক বলা যায় না। অবশ্য উচ্ছ্বাস থাকা চাই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় খেলার ভিতর ছেলেপিলেরা বড়োদের অনুকরণ করে। যেমন, একজন বাবা সাজিল; এখন আপিসে যাইতে হইবে, রান্না হয় নাই, চাকরকে সে ধমক লাগাইল। মেয়েরা খেলাতে মা বা জ্যেঠিমা-ঠাকুমা হইয়া এটা ওটা করিতে থাকে আর বিড়বিড় করিয়া বকে—"নাঃ, এদের কিচ্ছু হবে না, কেউ কাজ করতে আসবে না, খালি চা আর গল্প, আমি আর পেরে উঠছি না, কবে যে মরণ হবে।" ছেলেরা ট্রাম, বাস, টেলিফোন, পোস্ট অফিস, স্কুল, কলেজ, বাজার—যাহা কিছু তাহাদের ভবিষ্যতে প্রয়োজন সেইসব লইয়া খেলে। মেয়েরা পুতুলের বিয়ে দেয়, 'মা' হয়—মনে হয় যেন ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য তৈয়ার হইতেছে। তাহা হইলে দেখা যায়,

খেলাতে শুধু 'খেলা'ই থাকে না, তার ভিতর অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত আছে, শিশুর খেলা ভবিষ্যৎ জীবননাট্যের রিহার্সেল।

মনোবিদ্ ফ্রয়েড দেখাইতেছেন যে, শিশুর খেলাতে শিশু নিজের অভিলাষ ব্যক্ত করে। ছেলেপিলেরা অনেক সময় খেলে খাওয়া-দাওয়া সম্পর্কীয় কিছু লইয়া। রসগোল্লা, মাংস, লুচি, ক্ষীর, দই, চপ, কাটলেটে পাতা ভরিয়া গিয়াছে। বিরাট ভোজ—যত চাও তত পাইবে। এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় যে বর্তমানে দৈনন্দিন জীবনে শিশু আহার্যের ইচ্ছা অনেকটা দমন করিতে বাধ্য হয়। কারণ এই কণ্ট্রোলের বাজারে প্রতিদিন অত সব খাওয়া সম্ভব নয়। নেহাৎ একটু ডাল বা মাছ চাহিলেও মা-দিদিরা ধমকান। মুড়ি গুড়—তাহারও পরিমাণ নির্ধারিত। তাই সেই ভোজনের অতৃপ্ত খাওয়ার ইচ্ছা খেলাতে অভিব্যক্ত। এবার আর দমন করার কেহ নাই। শিশু জানে, তাহার কথা কেহ শোনে না, পরিবারে তাহার কোনো প্রতিপত্তি নাই। তাই খেলাচ্ছলে সে 'বাবা' হইয়া বসিল—যাহাকে যাহা বলে, সে তাহাই করে, ঠাকুর চাকর প্রভৃতি থরথর-কম্পমান। এইভাবে শিশুর যাহা চাহিদা তাহা সে খেলাতে মিটাইয়া লয়, কারণ বাস্তব জীবনে তাহাকে অনেক ইচ্ছাই দমন করিতে হয়। মেয়েরা খেলিবার সময় ভালো ভালো 'গয়না' পরে, ভালো ভালো জামা গায়ে দেয়, শাড়ি পরে—সবই কল্পনায়, কিন্তু তাতেও সুখ। প্রত্যেকটি খেলাই একটি ইচ্ছাপূরণের উপায়। এই জন্যই মনোবিশ্লেষণের জন্য শিশুদের খেলা পর্যবেক্ষণ করা নিতান্ত প্রয়োজন।

খেলার সামগ্রী এবং খেলার ধরন—এই দুইটি জিনিস লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে বিভিন্ন বয়সের শিশুদের বিভিন্ন প্রকারের খেলা পছন্দ হয় এবং বিভিন্ন প্রকারের সামগ্রী প্রয়োজন হয়। খুব অল্পবয়স্ক যাহারা তাহারা শুধু জল, কাদা বা টিনের টুকরা, মারবল, ছুরি, কাঁচি ইত্যাদি লইয়া খেলে। খেলার আয়োজনটি খুব সহজ—যেমন রান্না-বাড়া, বন-ভোজন,

গাড়িতে ভ্রমণ, ইত্যাদি। বড়ো ছেলেরা যখন খেলে তখন তাহাতে থাকে অনেক বুদ্ধির প্রয়োগ। কলকব্জা লইয়া হয়তো তাহারা মাতিয়া রহিয়াছে, অথবা একটি সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করিতেছে। তাহারা স্রেফ জলকাদা লইয়া খেলে না। দুই দলে যুদ্ধ লাগিয়াছে, কত কায়দা, কত কৌশল চলিতেছে—কেহ কাহাকেও পরাস্ত করিতে পারিতেছে না, যেন রুশ-জার্মানের লড়াই।

ছেলেপিলেদের বুদ্ধির বিকাশ আমরা খেলাতে দেখিতে পাই। যদি দেখি একটি দশ-বারো বছর বয়সের ছেলে নেহাৎ জলকাদা লইয়া তাহার অপেক্ষা অল্পবয়স্ক ছেলেদের সঙ্গে খেলে তবে বুঝিব তাহার আই. কিউ. কম। কি জিনিস দিয়া খেলে এবং কি খেলে তদ্দ্বারা বুদ্ধির পরিমাপ হয়। খেলাতে শিশুরা একটি সমস্যা বুদ্ধি খাটাইয়া পূরণ করার চেষ্টা করে। সুতরাং খেলাতে বুদ্ধির একটা 'এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট' চলে।

আর-একটি জিনিস খেলাতে বিকাশ পায়—নতুন কিছু সৃষ্টি করার ক্ষমতা। খেলাচ্ছলে মাটি দিয়া পাহাড় তৈয়ার করিল, সুন্দর বাগান-ওয়ালা বাড়ি তৈয়ার করিল, জন্তু মানুষ—কত রকমের জিনিস সৃষ্টি হইল। ছোটোখাটো টেবিল, টুল, ব্র্যাকেট এসব অনেক ছেলে তৈয়ার করিয়া ফেলে; মেয়েরা পুতুলের জন্য বেশ ভালো ভালো জামা করে, মোজা বোনে, রঙ-বেরঙের কাপড় দিয়া বা কাগজ দিয়া ফুল তৈয়ার করে। 'অভিনয়' খেলে, ড্রপসিন আঁকে, এমনি করিয়া খেলার ভিতর দিয়া সৌন্দর্যসৃষ্টি করে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে শিশুদের ভিতর যে নূতন কিছু করার একান্ত কামনা তাহা খেলার ভিতর প্রকাশ পাইতেছে। সাধারণ জীবনে যে সুযোগ পাওয়া যায় না, তাহা খেলাতে পাওয়া যায়—ইচ্ছামতো অব্যাহতভাবে যাহা খুশি তাহা তৈয়ার করিয়া লওয়া যায়। খেলার প্রবৃত্তির উৎস এই সৃষ্টি করার ক্ষুধা।

খেলা শিশু-জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ। খেলে না এমন শিশু দেখা

যায় না। উপরের আলোচনা হইতে দেখা গেল, খেলার ভিতর শিশু-মনের কত বৈচিত্র্যময় অভিব্যক্তি। খেলার প্রণালীর ভিতর তাহার অন্তরের কথা ফুটিয়া বাহির হয়, বুদ্ধির বিকাশ হয়, সর্বতোভাবে মনের স্ফুরণ হয়।

আদিম প্রবৃত্তি

শিশুদের ভিতর কতকগুলি সহজাত প্রবৃত্তি দেখা যায়। এই প্রবৃত্তিগুলি তাহারা কাহারো নিকট শিখে না। যেমন, ধরা যাক, একটি শিশু বোতল হইতে দুধ খাইতেছে, আমি রগড় করিবার জন্য বোতলটি মুখ হইতে সরাইয়া দিলাম, সে খুব চেঁচাইবে। তারপর পুনরায় বোতলটি মুখে দিলাম এবং সরাইলাম। তখন বেচারা এমন চটিয়া যাইবে যে হাত পা ছুড়িয়া কাঁদিয়া অস্থির হইবে এবং বোতলটি আবার মুখের কাছে ধরিলেও হয়তো দুধ খাওয়ার ইচ্ছা দেখাইবে না। সে অত্যন্ত রাগিয়া গিয়াছে। খুব ক্ষুদ্র শিশুদের এইরূপ রাগ লক্ষ্য করা যায়। মা-ঠাকুরমা যাঁহারা সন্তান পালন করেন, তাঁহারা খুব সহজে বুঝিতে পারেন শিশুরা কখন চটিয়া যায়। বিছানায় শুইয়া শিশু ভাবে, মা আসিবেন; অপেক্ষা করিল, কিন্তু মা আসিলেন না, তখন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কাঁদিতে থাকিবে। মুখ লাল হইয়া গিয়াছে—রাগের সর্বপ্রকার লক্ষণ দেখা গিয়াছে।

একটু বড় শিশুদের তো কথাই নাই। ইচ্ছার সামান্য এদিক ওদিক হইলেই প্লেট ভাঙিয়া দাপাদাপি করিয়া অস্থির। একটি ছেলে খেলিতেছে, আপনি মজা করিবার জন্য তাহার পুতুলটি লুকাইয়া রাখিলেন, তখন দেখিবেন সে উন্মত্তের মত ক্ষেপিয়া যাইবে। তাহার শিশু-হস্তের প্রহারও আপনাকে খাইতে হইবেই, উপরন্তু যদি সামনে ইট-পাটকেল বা লাঠি থাকে, তবে স্থানীয় ডাক্তারকে ডাকিবার প্রয়োজনও হইতে পারে। বাড়িতে দুইটি ভাই আছে; একটি পুরানো নিব লইয়া ঝগড়া বাধিল।

এ বলে 'এটা আমার', ও বলে 'না, আমার'। তখন উভয় উভয়কে চিমটি কাটিয়া হয়তো ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইয়া দিল। ছেলেদের মেজাজ একটু 'মিলিটারী' ধরনের থাকে।

যখন বড় হইতে থাকে, তখন শিশুর রাগ ক্রমশ কমিতে থাকে। বড় বড় ছেলেরা কথায় কথায় রাগ করে না। মনে মনে রাগ হইলেও সে তাহা চাপিয়া রাখার চেষ্টা করে। সুশিক্ষা এবং ভাল পরিচালনার ফলে তাহারা সহিষ্ণু হইতে শিখে এবং মাথা ঠাণ্ডা রাখিয়া বিচার করিতে শিখে। আবার অনেকে এই শিক্ষা না পাইয়া "রগ-চটা" থাকিয়া যায়। ক্রোধ-দমন সর্ব দেশের শাস্ত্রেরই অনুজ্ঞা—এই প্রবৃত্তিটিকে লইয়া চিন্তাশীল লোকেরা অত্যন্ত মাথা ঘামাইয়াছেন। কারণ ইহা শৈশবে সংযত না হইলে পরিণামে প্রকৃত সামাজিক এবং ব্যক্তিগত ক্ষতির কারণ হইয়া দাঁড়ায়। মনোবিদ্‌গণ বলেন, শিক্ষার ফলে ক্রোধ ভালো দিকে চালাইতে পারা যায়। যেমন, কোনও শিশুর মনে উচ্চ আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করা গেল। ন্যায়পরায়ণতা, দয়া, দেশপ্রেম, সমাজসেবা ইত্যাদি উচ্চ ধারণা তাহার ভিতর রহিয়াছে। সে দেখিল তাহার দেশের উপর কেহ অত্যাচার করিতেছে। তখন সে ক্রুদ্ধ হইয়া অত্যাচারীর উচ্ছেদ করিবে, এই পণ করিল। কোনও ব্যাপারে অবিচার দেখিল, নির্দয়তা দেখিল—তখন সে তাহার নিরাকরণে ব্যস্ত হইবে। এখানে ক্রোধ উপস্থিত হইলেও তাহা সৎকার্যের সহায়ক হইল। অর্থাৎ শিক্ষা ও সামাজিক আদর্শ গ্রহণের ফলে ক্রোধ সর্বনাশা না হইয়া উৎকৃষ্ট ভাবপ্রেরণার উৎস হইল।

সামান্য কারণে ভয় ক্ষুদ্র শিশুদের ভিতর দেখা যায়। জোরে শব্দ হইল, সে ভয়ে আঁৎকাইয়া উঠিল। বিড়াল বা পোকামাকড় দেখিয়া চিৎকার করিল। ছাদে উঠিতে সে ভয় পায়। উঁচু জায়গায় উঠিলে ভয়ে মাকে জড়াইয়া ধরে। সন্ধ্যাবেলা অন্ধকারে যখন সব কালো

দেখায় শিশুরা অসহায়ের মত মা-মাসীদের আঁকড়াইয়া ধরে। অনেক সময়ে কি দেখিয়া ভয় পায় বুঝিবার জো নাই। কোনও একটা জিনিস কল্পনা করিয়া পর্যন্ত ভয় পায়।

বড় হইলে যে মরণের ভয় কমিয়া যায়, তাহা নয়। অনেকের বাড়ে—আরসোলা, টিকটিকি, শুঁয়োপোকা দেখিয়া কেহ কেহ যেরূপ ভয় পান, তা ফ্লাইং বম্ দেখিয়াও অপরে পাইবে না। তবে কথা এই—ছেলেবেলাকার কাল্পনিক ভয়গুলি প্রায় সবই দূরীভূত হইয়া যায়। অন্তত ভয় পাইলেও চাপিয়া রাখিবার ক্ষমতা আমরা অর্জন করি। ক্রমশ বুদ্ধি ও যুক্তি দ্বারা ভয়ের কারণগুলি যে অর্থবিহীন তাহা ধরিয়া ফেলি। তবে বড়োদের ভিতর ভয়টা অনেক সময় মঙ্গলকর হইয়া দাঁড়ায়। যেমন সাপের বা বাঘের বা কলেরা-বসন্ত প্রভৃতি রোগের ভয়। শিশুরা এইসব স্থলে ভয় নাও পাইতে পারে, ফলত বিপদ্গ্রস্ত হইতে পারে (কারণ তাহাদের ভয় অনেকটা খামখেয়ালী রকমের—বাঘ সাপ দেখিয়া ভয় পাইল না, কিন্তু ফড়িং দেখিয়া হার্টফেল হওয়ার অবস্থা!)। কিন্তু আমরা ভয় পাইয়া সাবধান হইব, এবং জীবনরক্ষার সহায়ক হইবে ভয়। পাপের ভয়, ভগবানের ভয় ইত্যাদি থাকাতে আমরা অনেক দুর্ভোগ হইতে নিজে বাঁচি, অপরকেও বাঁচাই।

শিশুদের ভয় অনেকটা শাসনের ফলেও কমিয়া যায়। মা ছেলেকে বলিলেন, "এখানে একটু বোস্, আমি চচ্চড়িটা নামিয়ে আসছি।" এক মিনিটের ভিতর চিৎকার, "ওমা, এস, আমাকে খেয়ে ফেলছে।" মা তাড়াতাড়ি আসিয়া দেখিলেন, কিছুই না। ব্যাপারটা বুঝিয়া পিঠে চড় কষাইয়া বলিলেন, "ইয়ারকির জায়গা পাও না লক্ষীছাড়া?" ভয় কাটাইবার এই একপ্রকার ঔষধ। সামাজিক শাসন ভয় কমাইয়া দেয়। কোনও মুন্সেফ প্রফেসার উকিল ডাক্তার ইত্যাদি যদি ভূতের ভয় পান বা ব্যাঙ-ফড়িং দর্শনে নিকটস্থ উড়ে মালী বা হিন্দুস্থানী চাকরকে জড়াইয়া

ধরেন তবে খবরের কাগজে নাম না উঠিলেও পাড়ায় পাড়ায় ঠাট্টা-বিদ্রূপের চাপে প্রাণ অতিষ্ঠ হইবে। "ভীরু" নাম হউক—এটা কেহ চাহে না। ঐ নামটি যাহাতে না হয় তাহার জন্য সব ছেলেমেয়ে যথাসাধ্য 'সাহসী' হওয়ার চেষ্টা করে। ভীরু নাম রটিয়া গেলে সমাজে মুখ দেখানো ভার।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, আদিম ভয়-প্রবৃত্তি শিশুকালে খুব বেশিমাত্রায় থাকে এবং ভয়ের কারণ অনেক সময়ে হয় অলীক; পরে জ্ঞানলাভ, বিচারশক্তির বিকাশ এবং সমাজের শাসনের ফলে মিথ্যা ভয় কমিয়া যায়, এবং যুক্তিসঙ্গত ভয় জীবন ও সমাজ রক্ষার সহায়ক হয়।

ছেলেপিলেকে আদর করিলে তাহারা খুব আনন্দিত হয়। ভালোবাসা তাহারা স্বভাবত বোঝে, এই জন্যই মাকে শিশুরা ভালোবাসে। অনুরাগ প্রবৃত্তি তাহাদের মধ্যে প্রবল। মা-পিসী দূরে চলিয়া গেলে কাঁদিয়া আকুল হয়। অসুখ-বিসুখ হইলে মাকে কাছে পাইতে চায়। শোয়ার সময়, খাওয়ার সময় তাহার মাকে না হইলে চলে না।

কিন্তু যখন সে বড় হইয়া অন্যান্য ছেলেদের দলে ভিড়িয়া গেল বা খেলাধুলা, লেখাপড়া লইয়া ব্যস্ত রহিল, তখন ক্রমশ মায়ের প্রতি অনুরাগ এবং তাঁহার সান্নিধ্যকামনা কমিতে থাকে। অনেকে বরং বাড়িতে আসিতেই চাহে না। বাহিরের জীবন অনেক বেশি চিত্তাকর্ষক মনে হয়। শিক্ষা, জ্ঞান ইত্যাদি লাভের সহিত তাহার মন বৃহত্তর জগতের স্পর্শ পায় এবং মা-বাপের দিক হইতে অনুরাগ অনেকটা বাহিরের দিকে চলিয়া যায়। ইহাতে ফল ভালই হয়। কারণ যদি শিশু শুধু 'মা মা' কিংবা 'বাবা, বাবা' করিয়াই সারাজীবন কাটাইত তবে এ জগতে আপেক্ষিকতত্ত্ব, ক্রমোন্নতি—এসবই বা কে আবিষ্কার করিত? আর মহাকাব্য, সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস—এসবই বা কে লিখিত? বুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি মহামানবেরা মাতৃপ্রীতিকে বিশ্বপ্রীতিতে পরিণত

করিয়া সেই প্রেমামৃত জগতে বিলাইয়াছেন। শিশুকালে মানুষের যে অনুরাগ গৃহে মা-বাবা দাদা-দিদি প্রভৃতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, পরে তাহা বহির্জগতের নানা ব্যক্তি ও বস্তুর অভিমুখে প্রসারিত হয়। কেহ বা জ্ঞানবিজ্ঞান সাধনায় অথবা মনুষ্যজাতির উন্নতিপ্রচেষ্টায় মনের সমস্ত অনুরাগ নিয়োজিত করেন, কেহ বা মজলিস-সিনেমা পান-দোক্তা বিড়ি-সিগারেট চর্চায় তাহা অকাতরে বিলাইয়া দেন।

যৌন-প্রবৃত্তি শিশুদের ভিতর দেখা যায় কি? অনেকে এ প্রশ্ন শুনিয়া আঁতকাইয়া উঠিয়া বলিবেন, "ছি, সোনার বাছাদের নামে এ কি যা-নয়—তাই কথা?" কিন্তু কোনও পরিপোষিত ধারণার বশবর্তী না হইয়া যদি আমরা শিশুদের ব্যবহার, কথাবার্তা লক্ষ্য করি তবে দেখিব তাহাদের যৌন-ঔৎসুক্য আছে। ছেলেমেয়ের কি তফাত, ছেলে হয় কি করিয়া—এ সব প্রশ্ন তাহারা করিয়া বসে।

প্রফেসার ফ্রয়েড শৈশবে যৌন-জীবনের স্ফুরণ সম্পর্কে আশ্চর্যজনক কতগুলি কথা লিখিয়াছেন। তিনি বলেন—শিশুদের যৌনক্ষুধা প্রথমত মুখ দিয়া চুষিয়া তৃপ্তি পায়। অতি ক্ষুদ্র শিশু সব সময় মুখে আঙুল দিয়া চুষিতে থাকে। যাহা কিছু তাহাকে দেওয়া গেল তাহাই মুখে পুরিল এবং চুষিতে লাগিল। মুখ দিয়া চোষা এবং কামড়ানোয় তাহাদের বয়স্ক লোকেদের যৌনপরিতৃপ্তির মতই আনন্দ লাভ হয়, এবং ইহাই তাহাদের প্রাথমিক যৌন-জীবনের বিকাশ।

কিছু বড় হইলে ছেলেপিলেরা নিজেদের শরীর হইতে নির্গত মল লইয়া খেলিতে ভালবাসে। তাহাদের পরিষ্কার করিতে আসিলে বাধা দেয়, যেন উহা কত আদরের জিনিস। মলত্যাগ করার সময় তাহাদের খুব আনন্দ হয় এবং মল দর্শনে বিশেষ তৃপ্তি পরিলক্ষিত হয়। এই আনন্দ শিশুর কাছে যৌন-পরিতৃপ্তির আনন্দেরই তুল্য বলিয়া ফ্রয়েড মনে করেন।

তারপর আরও বড় হইলে যৌন-ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে তাহার কৌতূহল ও উৎসাহ জাগে। যৌন-ইন্দ্রিয় লক্ষ্য করা, তাহাকে মূল্যবান সামগ্রীর ন্যায় মনে করা শিশুদের ভিতর প্রায়ই দেখা যায়। মূত্র লইয়া নিজেদের ভিতর তাহারা খেলা করে, উল্লাস প্রকাশ করে। কে কত দূরে উহা নিক্ষেপ করে তাহা লইয়া আলোচনা হয়—যেন তাহা কত বড় আত্ম-প্রসাদের বস্তু। ইহাতে মনে হয় যেন শিশু যৌনতৃপ্তি লাভ করিতেছে। পরে অবশ্য যৌন-ইন্দ্রিয় ক্রমশ পরিপুষ্ট হয়, যৌবন উপস্থিত হয় এবং স্বাভাবিক যৌনজীবনের বিকাশ দেখা যায়। পরবর্তী জীবনে পূর্বাচরিত ক্রিয়াকলাপ বিস্মৃত হয়।

ফ্রয়েড আরও বলেন যে শিশুরা প্রথমত নিজের শরীরকেই নাড়া-চাড়া করিয়া যৌন-আনন্দ লাভ করে। আঙুল চুষিয়া, ঠোঁট কামড়াইয়া, নিজের যৌন-ইন্দ্রিয়ের দিকে চাহিয়া বা স্পর্শ করিয়া নিজেই তৃপ্ত। তাহার ইন্দ্রিয়-সুখের জন্য অন্য কোনও ব্যক্তির প্রয়োজন বোধ করে না। ইহাকে স্ব-যৌন অবস্থা বা Auto-sexual stage বলে।

পরে দেখা যায় একটি ছেলে অপর ছেলের সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব করিতেছে। ছেলেতে ছেলেতে খুব খাতির,—একজন আর একজন ভিন্ন থাকিতে পারে না। নিজের খাবার হইতে অর্ধেক তুলিয়া অপরকে দিতেছে। ইহারা মেয়েদের সঙ্গে মিশিবে না। আবার মেয়েরাও শুধু মেয়েদের সঙ্গেই মিশে। একটি মেয়ে অন্য একটির সঙ্গে 'সই' পাতায়। একটি আর-একটিকে না দেখিয়া থাকিতে পারে না, সইয়ের নিন্দা সহ্য হয় না। এই বাল্যবন্ধুত্বের পিছনে রহিয়াছে স্বজাতি-অভিমুখী যৌন-অবস্থা বা Homo-sexual stage।

ক্রমশ যৌবন বিকাশ লাভ করে, তখন পুরুষ নারী এবং নারী পুরুষ কামনা করে। ইহা পরজাতি-অভিমুখী যৌন-অবস্থা বা Hetero-

sexual stage। ইহাই স্বাভাবিক, পূর্বের বালসুলভ মনোভাব দূর হইয়া যায় এবং মানসিক বিকাশ অগ্রসর হয়।

এই যে ধাপে ধাপে শিশুর যৌন-অভিব্যক্তি হইতে থাকে, তাহাতে যদি বাধা পড়ে, তবে ব্যক্তির মানসিক ক্ষমতার পরিপুষ্টি হয় না। তাহারা বড় হইলেও নানা দিকে অপূর্ণ থাকিয়া যায়। ফ্রয়েড শিশুর যৌন-শিক্ষার উপর বিশেষ নজর দিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে যৌন-প্রবৃত্তির সহিত ব্যক্তির বহুপ্রকারের মানসিক শক্তি সংশ্লিষ্ট থাকে এবং যৌন-প্রবৃত্তির যথাযথ সুপরিচালনা না হইলে ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয় না। অবশ্য ফ্রয়েডের মতবাদ সবাই যে মানিয়া লইয়াছেন তাহা নহে, তবে বহু সত্যই তাঁহার অনুশীলনের ফলে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই।

উপরের আলোচনাতে দেখা গেল, শিশু কি লইয়া জন্মগ্রহণ করে এবং তাহার মানসিক শক্তি কি প্রকারে অভিব্যক্ত হয়!

শিশু-মনের বিকার

কি ভাবে শিশুর মন বিকাশ লাভ করে তাহা পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু প্রশ্ন এই—সব সময় তো যাহা চাই তাহাই হয় না, অপ্রত্যাশিত কোনও বাধা আসিয়া যদি মনের গতি ব্যাহত করে তবে তাহার কি ফল হইবে? এমন সব ছেলেপিলে দেখা যায় যাহাদের ধরন-ধারণ অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়, ইহারই বা কারণ কি? শিশুরা স্বাভাবিক ভাবে গড়িয়া না উঠিলে কী কী কুফল হয় এবং তাহাদের অবাঞ্ছনীয় ব্যবহারের কারণ কী, আমরা তাহাই এক্ষণে আলোচনা করিব।

প্রথমত একটি কথা বলিয়া রাখা প্রয়োজন। অনেক ছেলেপিলে বড় হইয়াও সম্যক্ মানসিক বিকাশ লাভ করে না। ইহা যে সব সময়ই শিশুর পরিচালনার বা তাহার নিজের দোষ, তাহা নয়। অনেকে চিরকাল নির্বোধ থাকিয়া যায়, কারণ তাহাদের জন্মগত মানসিক শক্তিই

খুব কম থাকে। হাজার চেষ্টা-চরিত্র করিয়াও তাহাদের উন্নতি সাধন সম্ভব হয় না। চেহারা দেখিয়া ইহাদের বুদ্ধির মাত্রা বোঝা যায় না। কোনও সূক্ষ্ম কাজ-কর্ম করিতে দিলে বা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে ইহাদের নির্বুদ্ধিতা ধরা পড়ে। মনোবিদ্‌গণ বুদ্ধি-যাচাই-প্রণালী দ্বারা নির্বোধদের বাছিয়া বাহির করেন।

নানা প্রকারের মানসিক শক্তি পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে যে কাহারও কাহারও মনের শক্তি চিরদিন দুই বছর বয়সের শিশুর মত থাকিয়া যায়। আর ইহা অপেক্ষা বাড়ে না। যেমন, হয়তো বয়স চল্লিশ বৎসর, কিন্তু এখনও সে নিজে নিজে কাপড় পরিতে বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজ করিতে অক্ষম। ইহাদের 'ইডিয়ট' (Idiot) বলা হয়। অন্য কেহ তত্ত্বাবধান না করিলে ইহাদের বাঁচিয়া থাকা দুষ্কর।

বড় হইলেও যাহাদের মানসিক শক্তি সাত বছর বয়সের ছেলে-মেয়েদের মত থাকিয়া যায় তাহাদের 'ইম্বেসিল' (Imbecile) বলে। যেমন, কোনও মধ্যবয়স্ক লোক সহজ কাজকর্ম সবই করিতে পারেন, লেখাপড়াও সামান্য কিছু জানেন কিন্তু কোনও সমস্যা সমাধান করিতে পারেন না বা বিবেচনাশক্তির অভাব দেখাইয়া থাকেন।

যাহাদের মনের শক্তি দশ বছরের শিশুর মত থাকিয়া যায় তাহাদের 'মরোন' (Moron). বলা হয়। ইহারা মোটামুটি সমাজে বেশ চলিয়া যায়, কিন্তু কোনও বিষয়ে বিশেষ দক্ষতা দেখাইতে পারে না।

আর এক শ্রেণীর নির্বোধ দেখা যায় যাহাদের বলে 'বর্ডার লাইন'। অর্থাৎ ইহারা স্বাভাবিক লোকেদের অপেক্ষা একটু নিচুতে। ইহাদের মানসিক শক্তি চিরদিন বারো বৎসরের বালকের মতো থাকিয়া যায়। এই প্রকার লোকদের লইয়া খুব বেশি কষ্ট পাইতে হয় না। তবে বিশেষ কৌশলপূর্ণ কাজ বা দায়িত্বপূর্ণ কাজ ইহারা করিতে পারে না।

মনোবিদ্ হলিংওয়ার্থ (Hollingworth) বলেন যে, উক্ত প্রকারের

নির্বুদ্ধিতা প্রায় ক্ষেত্রেই বংশানুক্রমিক বা জন্মগত। কিন্তু উহাদের লইয়া কি করিতে পারা যায়? চোর, গুণ্ডা, ডাকাত, বদ্‌মায়েস—ইহারা প্রায়ই 'মরোন' বা 'বর্ডার লাইন' হয়। ভালোমন্দ বুঝিতে না পারায় ইহারা পরের কথায় বিপথগামী হয় এবং তীক্ষ্ণবুদ্ধি না থাকাতে কোন্ কাজের কী ফল তাহা বিশ্লেষণ করিতে পারে না। সুতরাং ইহাদের কোনও একটা ভালপথে পরিচালনা করিতে না পারিলে সমাজের পক্ষে যথেষ্ট ক্ষতির সম্ভাবনা।

আমরা ইহাদের শিক্ষার জন্য কোনও বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারি। স্কুলে না পাঠাইয়া সহজ প্রণালীতে ইহাদের লেখাপড়া শিখাইবার আয়োজন করিলে ভালো হয়। ডিগ্রী না পাইলেও চেষ্টা করিলে ইহারা অনেকটা পড়াশুনা করিতে পারে।

আর একটি উপায় আছে। হাতের কাজ বা কলকব্জার ব্যবহার শিখাইলে ইহারা স্বাবলম্বী হইতে পারে, এবং কাজে নিযুক্ত থাকিলে বিপথগামী হওয়ার অবকাশ এবং সম্ভাবনা কমিয়া যায়। দড়ি পাকানো, ধোপার কাজ, রান্না-বান্না, মোটর চালানো, তাঁত বোনা, কলকারখানার সাধারণ কাজ ইত্যাদি একটা কিছু যদি ইহারা আয়ত্ত করে তবে সমাজেরও উপকার হয়, উহাদেরও জীবনযাত্রার সাহায্য হয়। বুদ্ধি অনুসারে বিভিন্ন প্রকারের বৃত্তি ইহাদের শিখানো উচিত। উক্ত হীন-বুদ্ধিরা যখন নিজেদের উপযুক্ত কাজ খুঁজিয়া না পায়, তখনই অসৎসঙ্গে মিশিয়া সমাজের ক্ষতি করে।

এই গেল এক শ্রেণীর ছেলেপিলেদের কথা যাহাদের ভিতরকার মানসিক শক্তিরই অত্যন্ত অভাব। কিন্তু এমন তো অনেক ছেলেমেয়ে দেখা যায় যাহারা বেশ বুদ্ধিমান, ভিতরে নানা রকমের প্রতিভারও আভাস পাওয়া যায়, অথচ "ইতোভ্রষ্টস্ততো নষ্টঃ" হইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। এই সব 'লক্ষ্মীছাড়া' ছেলেদের সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা আবশ্যক।

পিছিয়ে-পড়া ছেলে বা Backward Boy

এমন এক রকমের ছেলে আছে যাহাদের বুদ্ধি যথেষ্ট আছে কিন্তু তাহারা লেখাপড়ায় মোটেই উন্নতি করিতে পারে না। ইহারাই ব্যাক্‌ওয়ার্ড বা পিছিয়ে-পড়া ছেলে। অনেক ছেলে আছে যাহারা নিচের ক্লাসে বা ছেলেবেলায় খুব তীক্ষ্ণ থাকে, পরে ব্যাক্‌ওয়ার্ড হইয়া পড়ে। এই সব ছেলে বুদ্ধি-পরীক্ষায় উঁচু স্থান অধিকার করে, কিন্তু ক্লাসে শেষের বেঞ্চিতে বসে এবং ফেল করিতে থাকে। বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যায় যে, ইহারা পড়ে না, ধৈর্য ধরিয়া বেশিক্ষণ থাকিতে পারে না। কোনও উচ্চাকাঙ্ক্ষা বা সংকল্প ইহাদের নাই। কিন্তু তাহাই বা কেন হয়? এক হইতে পারে যে শিশুর মনে কোনও আঘাত লাগিয়াছে তাহাতে তাহার পক্ষে কিছুতে মনোনিবেশ করা সম্ভব নয়। আমি একটি ছেলেকে জানিতাম। নিচু ক্লাসে সে খুব ভাল ছিল, প্রথম স্থান অধিকার করিত। পরে উঁচু ক্লাসে উঠিয়া ছেলেটি একেবারে যেন 'বোকা' হইয়া গেল। অবশেষে সে ফেল হইল। ইহাতে সবাই খুব আশ্চর্য হইয়া পড়েন। অনুসন্ধান করিয়া দেখা গেল—ছেলের মা মারা যান এবং অল্পকালের মধ্যেই তাহার একটি বিমাতা লাভ হয়। শিশুর মনে এত বড় আঘাত লাগিল যে তাহার মন ভাঙিয়া পড়িল এবং বুদ্ধি যেন জড়তা-গ্রস্ত হইল। সে পিছিয়ে-পড়া ছেলেদের দলে ভিড়িয়া পড়িল।

অথবা এমনও হইতে পারে যে পরিবারে ভীষণ দুঃখ বা বিপদ উপস্থিত হইল, বাবা দেউলিয়া হইলেন, অথবা অভিভাবক অত্যন্ত মার-ধোর করেন, কিংবা ছেলে চায় ডাক্তার হইতে কিন্তু বাবা চায় তাহাকে এ. আর. পি.-তে ঢুকাইতে—এই রকম ক্ষেত্রে শিশুর মন আহত এবং হতাশ হইয়া পড়ে। তখন লেখাপড়াতে ছেলেপিলেদের অবনতি হয়। মনোবিদ্‌গণ, বিশেষত মনোবিশ্লেষকেরা (Psycho-analyst) বলেন যে, মানসিক আঘাতে শিশুরা 'বোকা' বনিয়া যায়, তাহাদের

বুদ্ধির অপলাপ হয়। বাহ্যত তাহা বোঝা যায় না, বিশ্লেষণ করিয়া কারণ খুঁজিয়া বাহির করিতে হয় এবং শিশুর মনে পুনরায় আশা ও উৎসাহ আনিয়া দিলে তাহার উপকার হয়, উন্নতি অব্যাহত থাকে।

এমন অনেক ছাত্র পাওয়া যায় যাহারা ইংরেজীতে ভালো কিন্তু অঙ্কে অত্যন্ত খারাপ ; ইতিহাসে ভালো, কিন্তু ভূগোলে খারাপ। যথেষ্ট বুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও এমন হয় কেন ? গবেষণা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ইহাদের ভিতর কতকগুলি বিষয়ের প্রতি অত্যন্ত বিরাগ থাকে। যেমন, অঙ্ক পারে না, অর্থাৎ অঙ্ক ভালো লাগে না। তাই অঙ্কের জন্য খাটিতে ইচ্ছা করে না, ফলও ভালো হয় না। যদি এই ঔদাসীন্য কাটিয়া যায় এবং বিষয়ের প্রতি অনুরাগ আসে, তখন ঐ বিষয়েও তাহার অদ্ভুত উন্নতি দেখা যায়। কোনও একটি অঙ্কের পণ্ডিতের কথা আমি জানি। তিনি স্কুলে একবার অঙ্কে শূন্য পাইয়াছিলেন। একজন খুব ভাল শিক্ষক তাঁহার জন্য রাখা হইল। তিনি উঁহার মনে অঙ্কের প্রতি অনুরাগ জন্মাইয়া দিলেন। তাহার পর অঙ্কে তাঁহার প্রতিভা খুলিয়া গেল।

অনেক শিক্ষক নিজের অক্ষমতার জন্য শিশুর মনে বিষয়ের প্রতি অনুরাগ না জন্মাইয়া প্রায়ই অশ্রদ্ধা জন্মাইয়া থাকেন। দেখা গিয়াছে শিক্ষক পরিবর্তনের ফলে পাঠে অনেকের উন্নতি হইয়াছে। নতুন মাস্টার মহাশয়কে ছেলে ভালোবাসে, সুতরাং তিনি যাহা পড়ান তাহাও সে ভালোবাসে। এই ব্যক্তিত্বের জোর শিক্ষকের পরম সহায়।

অনেক সময় ছেলেরা জিদ্ করিয়া কোন বিষয়ে তাচ্ছিল্য দেখায়। বাবা কি মা হয়তো বলেন, 'এই গাধা, দেখব ইংরেজীতে তুই কত নম্বর পাস।" ছেলেটি হয়তো আশানুরূপ ভালো করিতে পারিল না। তখন বাবা সব সময়ই টিপ্পনি কাটেন, "চাকরি ক'রে খেতে হবে না, যাও কুলীগিরি করগে", "রান্না-টান্না শেখ, রাঁধুনে বামুন হতে হবে যে।" ছেলে এবার সংকল্প করিল, যাত্রার দলে ঢুকিতে হয় সেও ভালো, তবু

ইংরেজীর জন্য একটুকুও সে খাটিবে না। বাড়িতে অত্যাচার, কটুকথা বা অভিভাবকের মারধোর এবং অপমানের শোধ তোলে সে বার্ষিক পরীক্ষার ঘরে বসিয়া।

একটি বিষয়ে খারাপ বলিয়া ছেলেরা ক্রমশ অন্য বিষয়েও খারাপ হইতে থাকে এবং আত্মবিশ্বাস হারাইয়া ফেলে। যথাশক্তি আমাদের এই সমস্যার সমাধান করা উচিত।

খাওয়ানোর সমস্যা

অনেক শিশু সহজে খায়, তাহাদের খাওয়াইতে বেগ পাইতে হয় না। কিন্তু অনেক ছেলেমেয়েকে খাওয়াইবার সময় দাঙ্গাহাঙ্গামার উপক্রম হয়। হাত পা ছুড়িয়া, বমি করিয়া, চিৎকার করিয়া, ঘামিয়া ইহারা অস্থির হয়। এসব ক্ষেত্রে কোনো মানসিক গোলমাল থাকে। অবশ্য শারীরিক কোনও রোগ যদি শিশুর থাকে তো অন্য কথা। বেশির ভাগ জায়গায় শিশু মনে মনে উত্তেজিত থাকায় ঐ রকম হয়। শিশু হয়তো মাকে অনেকক্ষণ চাহিয়াছিল, পায় নাই; বা অন্য কিছু খাইতে চাহিয়াছিল, তাহা তাহাকে দেওয়া হয় নাই। অনেক মা-মাসী-পিসী আছেন যাঁহারা জোর করিয়া ছেলেকে খাওয়াইতে চান—সে চাউক বা না চাউক। শিশুর আর খাইবার ইচ্ছা নাই, তবু তাহাকে মোটা হইবার জন্য খাইতেই হইবে। অথবা বাড়িতে দিনরাত্রি অত্যধিক বাঁধা-বাঁধি কড়াকড়ি চলিতেছে। এসব ক্ষেত্রে শিশু তাহার আপত্তি বা অসম্মতি ঐভাবে জানায়।

অনেক ছেলেপিলে অত্যন্ত ধীরে ধীরে খায়। হয়তো বারোটায় ঠাকুরমা খাওয়াইতে বসিলেন, বেলা দুইটা পর্যন্ত ঐ পর্ব চলিল। ছেলে একবার একটু খায়, তারপর খেলে, তারপর দৌড়াদৌড়ি করে, কাঁদে—এইভাবে তামাশা চলিতে থাকে। ইহার কারণ সহজ—অত্যধিক আদর। শিশু দেখে তাহার খাওয়া সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে।

এই ভাবে প্রশ্রয় পাইতে পাইতে সে রগড়ের মাত্রা বাড়াইয়া দেয়। তখন অভিভাবকের ধৈর্যের সীমাও অতিক্রান্ত হয়।

আর-এক দলের ছেলেপিলে দেখা যায় যাহারা খাইয়াই চলিয়াছে—'না' কখনও বলে না। কখন থামিতে হইবে তা-ও জানে না বা থামিবার মতলবও নাই। ঐ অভ্যাস সাধারণত নির্বোধ বা ক্ষীণবুদ্ধি (Subnormal) শিশুদের ভিতর দেখা যায়। 'ওজন বুঝিয়া ভোজন করা' ইহাদের শিখানো হয় নাই। আদর দিয়া বেশি খাওয়ানোর ফলে তাহাদের ঐরকম অস্বাভাবিক 'বৃকোদরত্ব' লাভ হয়।

নিদ্রা-সমস্যা

রাত্রি যতই বাড়িয়া চলুক, একপ্রকারের ছেলেমেয়ে আছে তাহাদের চোখে ঘুম নাই। বড় কর্তারা ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন, কিন্তু উহারা জাগিয়া আছে। আমি একটি গ্রাম্য পরিবার জানিতাম। ঐ পরিবারের ছেলেরা রাত বারোটার সময় লণ্ঠন জ্বালাইয়া 'হা-ডু-ডু' খেলিত। অনেক সময় দেখা যায় শিশু ঘুমাইয়াছে, কিন্তু প্রায়ই অস্থির হইয়া এপাশ ওপাশ করিতেছে বা অস্বস্তি বোধ করিতেছে। কিছুতেই সুনিদ্রা হইতেছে না অথবা স্বপ্ন দেখিয়া ভয়ে আঁতকাইয়া উঠিতেছে, কখনও বা বকবক করিয়া কথা বলিতেছে। আবার এমনও দেখা যায় যে কোন কোন শিশু যেন জাগিয়া থাকিতে কষ্টবোধ করে। পড়িবার সময় ইহারা ঘুমায়, খেলিবার সময় ঢুলুঢুলু নেত্র, সব সময়ই ঝিমাইতে অভ্যস্ত। কুম্ভকর্ণের জাতি না হইয়াও ইহারা সে অভাগাকে ছাড়াইয়া যায়।

অস্বাভাবিক নিদ্রার কারণ কোনও শারীরিক ব্যাধি হইতে পারে। কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই ঐ কারণ থাকে না। অনেক ছেলেমেয়ে ঘুমাইতে চাহে না, ভাবে—ঘুমাইলে কি যেন মজা দেখিতে পাইবে না। অথবা অজানা ভয়ে উহারা অস্থির হয়। স্বপ্নে কিম্ভূতকিমাকার প্রাণীদের দেখিয়া তাহারা অত্যন্ত ভয় পায় এবং ঘুমাইলে পাছে ঐসব দেখিতে হয়

সেই ভয়ে ঘুমাইতে চায় না। যেসব ছেলেপিলে 'অসুখী' অর্থাৎ যাহাদের স্নেহ করিবার কেহ নাই, বা মা-বাবা নির্যাতন করেন, তাহারা ঘুমের ভিতরও চঞ্চলতা প্রকাশ করে। কারণ, মনে একটা উদ্বেগ থাকাতে তাহাদের ভালো ঘুম হয় না। ঘুমের পূর্বে যদি কোনও উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনা ঘটে বা বাড়িতে অথবা আশেপাশে হুলস্থূল চলিতে থাকে তাহাতেও ছেলেপিলেদের ঘুমাইতে দেরি হয়। ঘুমাইতেও দেওয়ার প্রয়োজন, নহিলে দুপুররাতেও তাহারা ঘুমাইবে না। এ-বিষয়েও মা-বাবার বিশেষ যত্নবান হওয়া উচিত। যে-সব ছেলে সারাদিন ঝিমায় তাহাদের রাত্রিতে হয়তো কম ঘুম হয়, বা ভাল খাওয়া-পরা জোটে না, শরীর অত্যন্ত দুর্বল। হীনশক্তি শ্রেণীর (Sub-normal) শিশুদের ভিতর ঝিমানো রোগটা একটু বেশি ; কারণ, তাহারা কোনো বিষয় ভালোভাবে গ্রহণ করিতে পারে না, কিছুতেই তাহাদের মন লাগিয়া থাকে না। তাহাদের দেখিবার, শুনিবার, বুঝিবার বিশেষ কিছু নাই। সুতরাং ঝিমাইয়া কাটানো ছাড়া উপায় কি ?

বদমেজাজ

শৈশবে ছেলেপিলেরা যত সহজে চটে এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সাহায্যে রাগ জাহির করে, পরে আর তাহা করে না। ছেলেপিলেদের রাগ আমরা কী করিয়া বুঝি ? দুই প্রকারে তাহার অভিব্যক্তি হয়।

প্রথমত শিশু চটিয়া গিয়া কাহাকেও মারপিট্ করে, জিনিস ভাঙে, কামড়ায়—অর্থাৎ শরীরের কসরৎ দেখায়। শুধু তাই নয়, তারস্বরে চিৎকার করে এবং দুই-চারটি 'আন্‌পালামেণ্টারি' বুলি ছাড়ে। পাড়ার লোকেরা টের পায়। রাস্তায় লোক জমিয়া যায়, মহা হুলস্থূল কাণ্ড ! অভিভাবকদের প্রাণান্ত অবস্থা। বাধা দিতে গেলে ফল ভয়াবহ হয়, কারণ তাহা হইলে শিশু জিনিসপত্র ভাঙিয়া শেষ করিবে। ক্রমে যখন শক্তিতে আর কুলায় না তখন শিশুর মেজাজ ঠাণ্ডা হইতে থাকে।

দ্বিতীয়ত অনেক শিশুর রাগ ভাষা বা অঙ্গচালনায় অভিব্যক্ত হয় না, নীরবতা এবং নিষ্ক্রিয়তার প্রকাশ হয়। এই শ্রেণীর ছেলেপিলেরা চটিয়াছে কি-না সহজে বুঝিবার জো নাই। চুপচাপ গম্ভীর মুখে এক-কোণে বসিয়া আছে—মনে মনে কিন্তু চটিয়া আগুন। ইহারা বড় বেশি কিছু অন্যের ক্ষতি করে না। বিমর্ষ হইয়া থাকিতে থাকিতে পরে মানসিক রোগগ্রস্ত হইতে পারে—এই যা ভয়।

যে সব ছেলেপিলে তাহাদের কাজকর্মে বেশি বাধা পায় তাহাদেরই এরূপ ক্রোধের অভিব্যক্তি দেখা যায়। শিশু যাহা করে তাহাই খারাপ এরূপ মনে করিলে সেও চটিয়া থাকে। যাহা চায় তাহা কখনও পায় না —সে অত্যন্ত বিরক্ত হইতে থাকে। তারপর হঠাৎ রাগিয়া গেলে আর সহজে থামে না—অনেক দিনের বিফলতার প্রতিশোধ তুলিতে চায়। আদুরে ছেলেপিলেরা অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করার এবং জিনিস আদায়ের জন্যও অনেক সময় এই 'পলিসি' গ্রহণ করে। চেঁচাইলে বা জিনিসপত্র ভাঙিবার হুমকি দেখাইলে অনেক চাহিদা নিশ্চয়ই মিটিবে, কিংবা মা-মাসী-ঠাকুরমা নিশ্চয়ই দৌড়াইয়া আসিবেন এবং নানাবিধ উপহার দিবেন যাহাতে খোকাবাবু দয়া করিয়া চুপ করেন।

হিংসুক ছেলেরাও অনেক সময় ঐ রকম কাণ্ড করে। ছোটো ভাই বা অন্য কাহারও উপর তীব্র হিংসা, তাহার খাওয়া-পরা কাপড়-জামা সব অসহ্য মনে হয় এবং সর্বদাই এইরূপ উত্তেজনা পোষণ করার ফলে তাহাদের মেজাজ অত্যন্ত খারাপ হইয়া পড়ে। বাড়িতে যদি বাবা, মা বা অন্য কেহ খুব রাগী থাকেন তবে ছেলেমেয়েরাও তাহার নকল করে। বাবা হয়তো রাগিয়া প্লেট ভাঙেন, দোয়াত ছুঁড়িয়া ফেলেন—সন্তানরাও বাবার মতো হইতে চেষ্টা করে। কোনো কোনো মহিলা রাগিয়া চুল ছিঁড়েন, চীৎকার করেন, গয়না ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেন—এই রকম পরিবারের ছেলেমেয়েরা অত্যন্ত বদমেজাজী হয়।

মিথ্যাবাদিতা

অনেকের ধারণা, শিশুরা দেবতার মত নির্দোষ, কখনও মিছা কথা বলে না। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই শিশুরা বক্‌বক করিয়া ঝুড়ি ঝুড়ি মিছা কথা বলে—অবশ্য সব সময় যে ঠকাইবার জন্য বলে, তা নয়। হার্টসর্ন্‌ এবং মে (Hartshorne & May) গবেষণা করিয়া দেখিয়াছেন যে, মিথ্যুক ছেলেপিলেদের একটু বেশি কল্পনা করার অভ্যাস, কোন কিছু তলাইয়া দেখার ইচ্ছা তাহাদের নাই। উঁহারা আরও বলিয়াছেন যে, মিথ্যাবাদী ছেলেরা বুদ্ধিতে একটু কাঁচা। প্রফেসার বার্ট্‌ (Burt) অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন, ছেলেমেয়েদের মিছা কথা বলার অনেক উদ্দেশ্য থাকিতে পারে। একটি ছেলে আসিয়া বলিল, "মা, দেখ, আমাদের কুকুরটার সঙ্গে প্রকাণ্ড একটা গাধা খেলা করছে।" এখানে ছেলেটি নেহাত মজা করিবার জন্য একটু রঙ ফলাইয়া কথা বলিয়াছে।

অথবা নিজের বীরত্ব প্রকাশ করিবার জন্য একটা জলজ্যান্ত মিথ্যা গল্প রচনা করিয়া বসে। 'জানো মা, আমি দুটো চোরকে ধ'রে পুলিসে দিয়ে এসেছি' 'একটা বাঘ গুলি ক'রে মেরেছি'—এই রকম বীরত্বব্যঞ্জক কথা তাহাদের মুখে অনেক শোনা যায়।

কাহারও প্রতি ঈর্ষা থাকিলে ছেলেরা অনেক মিথ্যা কথা তাহার নামে লাগায়। শিক্ষক মহাশয়েরা খুব ভালো করিয়াই জানেন যে, ছাত্রদের মধ্যে দলাদলি থাকিলে দুই পক্ষ হইতেই কত কাল্পনিক অভিযোগ আসিতে থাকে। বাড়িতেও ভাই-বোনদের ভিতর হিংসা থাকিলে বাবা আপিস হইতে আসিবামাত্র তাঁহাকে অজস্র নালিশ শুনিতে হয়। অভিযোগের ভিতর সত্য অনেক সময়ে কমই থাকে।

মিথ্যা কথা বলিয়া ঠকানো—এও যথেষ্ট দেখা যায়। মাস্টারমহাশয়কে, বাবাকে, কাকাবাবুকে—অনেক ছেলে প্রায়ই 'বোকা' বানাইয়া দেয়। মিছা কথা বলিয়া টাকা আদায়, দুষ্কর্ম করা অহরহ চলিতে থাকে।

দেখা গিয়াছে যে, মিথ্যুক ছেলেমেয়েরা বেশির ভাগ এমন সব পরিবার হইতে আসে যেখানে নৈতিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। মিথ্যুক ছেলে-মেয়েদের বাপ-মা অনেক সময় নিজেরাই মিথ্যুক। অথবা, সামান্য অপরাধের জন্য উহারা এমন শাস্তি পায় যে ভয়ে মিথ্যা কথা বলিয়া শাস্তি এড়াইতে চায়। অনিচ্ছাসত্ত্বেও একটা জিনিস ভাঙিয়া ফেলিয়াছে, এখন কি উপায়? যদি বাবা জানেন? স্রেফ অস্বীকার করাই ভাল। আত্মরক্ষার উপায় হিসাবে অসহায় শিশু অনেক সময় মিথ্যা কথা বলে। আমাদের প্রথমত অনুসন্ধান করা উচিত, শিশু কেন মিছা কথা বলে? কি তাহার সমস্যা? ভাল করিয়া তলাইয়া দেখিয়া বিচার করা উচিত এবং এমনভাবে তাহাদের পরিচালনা করা উচিত যেন শিশুর মিথ্যা কথা বলিবার কোন প্রয়োজনই না হয়।

হীনম্মন্যতা বা আত্মলাঘব (Inferiority Complex)

অনেক ছেলেপিলে কোন কাজেই অগ্রসর হয় না—প্রশ্ন করিলে বলে, 'না, আমি পারব না।' খেলায় যোগ দেয় না, ক্লাসে একেবারে শেষের বেঞ্চিতে বসিয়া থাকে। লোকজন দেখিলে পলাইয়া যায়। কথা বলিবার সাহস নাই এবং সব সময়ই ভাবে 'আমার কিছু হইবে না' 'আমার চেহারা খারাপ' 'আমি গরিব'। নিজেকে কীটাণুকীট মনে করে। এই রকম ছেলেদের গড়িয়া তোলা অত্যন্ত কঠিন, আর এই মনোভাবকে প্রফেসার অ্যাডলার (Adler) নাম দিয়াছেন, ইন্‌ফিরিয়ারিটি কম্‌প্লেক্স্। এই ধরনের লোকেরা বলিবে, 'আমি সুযোগ পাই নাই, তাই কিছু করিতে পারে নাই।' অন্য ছেলেদের অবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত ঈর্ষা প্রকাশ করে এবং ভাবে 'ওদের গাড়ি আছে, আমার কিছু নেই'। এই কথা ভাবিতে ভাবিতেই দিন কাটে, খাটিয়া যে সেও কিছু হইতে পারে এমন বিশ্বাস নাই। ইহারা কোনও নূতন কাজ বা নূতন বিদ্যা অভ্যাস করিবে না, পাছে 'না পারে'। "পারিব না" বলিয়া মুখ ভার"

করিয়াই আছে। খেলাধুলাতে কোনও প্রকার উৎসাহ দেখায় না বলিয়া সবাই ইহাদিগকে 'কুনো' ছেলে বলে। শারীরিক ও মানসিক দিক হইতে এরূপ মনোভবে অত্যন্ত ক্ষতিকর। এই সব শিশু বাস্তব জগতে বিফল হওয়াতে একটা কল্পনার রাজ্য গড়িয়া সেখানেই বিচরণ করে। মনে মনে দিবাস্বপ্ন দেখে: সে এক 'ফুটবল টিম' গড়িয়া তুলিয়াছে, দেশ-বিদেশ হইতে তাহার আমন্ত্রণ আসিতেছে। লেখাপড়া শিখিয়া এমন বিদ্বান হইল যে ভারতবর্ষে কেহই তাহার সঙ্গে কথা বলিবার উপযুক্ত নয়।—কল্পনাতেই সে সফলতার আনন্দ লাভ করে।

এই প্রকার মনোভাব যে গড়িয়া উঠে তাহার অনেক কারণ। যে সব অভিভাবক ছেলেমেয়েদের কাছে অনেক বেশি কিছু আশা করেন তাঁহারা প্রায়ই এই মনোবিকারের জন্য দায়ী। ছেলেকে আই. সি. এস. হইতেই হইবে, মেয়েটি সর্বগুণান্বিতা হইবে—খুব বেশি চাপের ফলে কিছুই হয় না। বরং হিতে বিপরীত হয়—আত্মবিশ্বাস নষ্ট হইয়া যায়। আমাদের স্বীকার করা উচিত যে, সব ছেলের সব কিছু হয় না। আমরা যদি তাহাকে সব সময় খোটা দিয়া বলি, 'তোর কিছু হবে না'—বেচারা তখন কি করিবে? চূড়ান্ত চেষ্টা করিয়াও যদি আশানুরূপ ফললাভ না হয় তখন তাহাকে আর ঠাট্টা করা উচিত হয়। করিলে সে ক্রমশ একেবারে হাল ছাড়িয়া দিবে এবং জীবনে বিফল হইবে। শিশু যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া নিজ ক্ষমতানুসারে যেটুকু সাফল্য অর্জন করিতে পারে, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। নতুবা তাহাকে অপমান করিলে অথবা তাহার প্রতিকার্যে নৈরাশ্য এবং অসন্তোষ প্রকাশ করিলে তাহার মনের বিশ্বাস একেবারে চলিয়া যাইবে এবং সে নিজেকে সর্বদাই শক্তিহীন বা অক্ষম বলিয়া মনে করিবে।

অত্যধিক আদর দিলেও ঐ রকম হীনম্মন্যতা বা আত্মলাঘবের ভাব জন্মে। আদুরে ছেলেমেয়েরা বাপ-মা বা অন্য ব্যক্তির উপর অত্যন্ত বেশি

নির্ভর করে। কারণ, তাহারা নিজেরা কিছুই করে না, দাদা-দিদিরা তাহার করিবার পূর্বেই সব-কিছু করিয়া দেন। স্বাধীন চেষ্টার কখনও প্রয়োজন হয় না বলিয়া তাহার ইচ্ছাও আর থাকে না। অন্যের উপর নির্ভর করিতে গিয়া তাহারা অসহায় হইয়া পড়ে। পরীক্ষার হলে বা খেলার মাঠে পিসী-মাসীরা তো আসিয়া উদ্ধার করিবেন না, তাই বেচারীরা বিফলতার ভয়ে কোন কাজে অগ্রসর হয় না। তাহাদের মনে 'আত্মলাঘব' স্থায়ী হইয়া দাঁড়ায়। সুচিন্তিত প্রণালীতে শিশুদের শিক্ষা দিলে এইরূপ বিভ্রাট উপস্থিত হইয়া জীবন পণ্ড করে।

তোতলামি

তোতলা ছেলেরা আমাদের একটি বড় সমস্যা। বড় হইয়া উহারা অত্যন্ত লজ্জিত থাকে এবং লোকের সঙ্গে কথাবর্তা বলা এড়াইয়া চলে। অনেকের ধারণা জিভের দোষের জন্য ঐরূপ হয়। মনোবিদ্‌গণ দেখিয়াছেন যে, মানসিক গণ্ডগোলের জন্যই শিশুরা তোতলামি প্রকাশ করে। ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া শিশু যখন অভিভাবকদের সামনে উপস্থিত হয় তখন তোতলামি বাড়িয়া যায়।

অনেক শিশু স্পষ্টভাবে কথা বলার অভ্যাস না করায় তোতলা থাকিয়া যায়। নূতন কথা শিখিবার সময় ভালো উচ্চারণ করে নাই, বা রগড় করিয়া তোতলাইয়া কথা বলিত ; ফলে তোতলামি অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে ; অথবা হয়তো, তোতলা ব্যক্তিকে অনুকরণ করিতে গিয়া সে আপন উচ্চারণ বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছি।

অনেকে চিন্তা না করিয়া তাড়াতাড়ি কথা বলিতে যাইয়া বিপদে পড়ে, তাহাদের কথা জড়াইয়া যায়। অথবা কোনও স্থানে কি ভাবে কথা বলিতে হইবে বুঝিতে না পারিয়া তোতলাইতে থাকে। যে সব ছেলেপিলে নিজেদের খুব অসহায় মনে করে এবং যাহাদের 'লঘুত্ববোধ' অত্যন্ত বেশি তাহারাও তোতলামি অভ্যাস

করিয়া বসে, কারণ কথা বলিতে যাইয়া ভাবে 'হয়তো ঠিক করিয়া বলিতে পারিব না'।

ট্রেভিস্ নামক এক মনোবিদ্ গবেষণা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, প্রায় ছয় শত তোতলা ছেলের আত্মীয় কেহ-না-কেহ তোতলা ছিল। তিনি মনে করেন, ইহা বংশগত।

কিন্তু ইহা সত্য যে, তোতলামি দূর করা যায়। নূতন ভাবে কথা বলার অভ্যাস শিক্ষা দিতে হইবে। আর শিশুর মনে কোনও ভয় বা আতঙ্ক বা লঘুত্ববোধ যেন না থাকে। মানসিক শান্তি এবং আত্ম-বিশ্বাস শিশুর ভিতর থাকিলে অভ্যাস-পরিবর্তন কঠিন হইবে না। মনে রাখিতে হইবে ঐ বদ অভ্যাস শৈশবে জন্মে। ওয়ালিন (Wallin) দেখিয়াছেন, প্রায় শতকরা ৮১টি শিশু স্কুলে আসার পূর্বে তোতলামি করিত। শৈশবেই দোষটি দূর করিতে হইবে।

বদ ছেলে

যে-সব ছেলে সমাজের আদর্শ মানিয়া চলে না এবং নিজের ও দশের অহিত করে তাহাদের আমরা 'বদ ছেলে' আখ্যা দিই। মোটামুটি কতকগুলি অপরাধের নাম করা যাইতে পারে, যাহা এই শ্রেণীর ছেলেপিলেরা করিয়া থাকে।—

চুরি, গুণ্ডামি, অশ্লীল ব্যবহার, বাড়ি হইতে পলায়ন ইত্যাদি।

এখন ইহাদের মতিগতি এইরূপ কেন হয় তাহার আলোচনা করা যাক। লম্ব্রসো (Lombroso) বলিয়াছেন যে, অপরাধী ছেলেরা একটা আলাদা শ্রেণীর মানুষ—তাহাদের চেহারাতেই ধরা পড়ে। এই মত অনেকেই মানিয়া লন নাই, গবেষণা করিয়া দেখা যায় যে 'বদ ছেলে' বলিয়া কোনও বিশিষ্ট জীব নাই—বিশেষ কোনও কিম্ভূতকিমাকার চেহারাও তাহাদের নাই। ভদ্রলোকের মতো যাহাদের চেহারা,

তাহারাও গুণ্ডা হইতে পারে, আবার বদ চেহারার লোকও ভালো হইতে পারে।

বদ ছেলেদের বুদ্ধি কি রকমের? একারসন্ (Ackerson) দেখিয়াছেন যে, কতকগুলি অপরাধ খুব বেশি বুদ্ধিমান ছেলেমেয়েরা করিয়া থাকে, আর কতকগুলি অল্পবুদ্ধি শিশুরা করিয়া থাকে। ইহা সহজেই অনুমেয়। কারণ, বজ্জাতি করিতেও কূটবুদ্ধির দরকার। যে-সব ছেলের বুদ্ধি অত্যন্ত বেশি অথচ বুদ্ধির চালনা সদ্ভাবে হয় নাই তাহারা চুরি, গুণ্ডামিতে অদ্বিতীয় হয়। ধরুন, একটি বস্তির ছেলে—অসাধারণ তার বুদ্ধি, 'আই. কিউ' খুব উঁচু, সঙ্গ ভাল পায় নাই, শিক্ষার সুযোগ পায় নাই, বাড়িতে কোনও আকর্ষণ নাই, সে জানালা ভাঙিয়া গৃহপ্রবেশ করিতে বা বাস-ট্রামের বাবুদের সর্বনাশ করিতে নিশ্চয়ই পটু হইবে। বেশি বুদ্ধিমান ছেলে এই সব 'ডিপার্টমেণ্টে' ঢুকিলে পুলিস কমিশনার এবং দারোগাবাবুদের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠে। ডিটেক্‌টিভ নভেলে আমরা তাহার পরিচয় পাই। আবার বুদ্ধি খুব কম থাকিলে হিতাহিতজ্ঞানটাও কম থাকে, কিসের কি পরিণাম—বালকেরা বোঝে না, ফলে, অসৎসঙ্গে পড়িয়া দলকর্তাদের কথা প্রাণপণে পালন করে এবং ধরা পড়িবার সময় এই মূর্খ হতভাগারাই ধরা পড়ে, চতুর দলপতিরা সরিয়া পড়ে।

গুণ্ডামি ইত্যাদির একটি কারণ ইহাও বলা যায় যে, যে-সব ছেলেপিলে স্কুলে, খেলার মাঠে কোথাও স্থান পায় না, যাহাদের কেহ গ্রাহ্য করে না, তাহারা নিজেদের এই হীনতা ঘুচাইবার জন্য এমন একটা কিছু করিয়া বসে যাহাতে তাহার প্রতিষ্ঠা লাভ হয়, ভাবে—সুনাম যখন করিতে পারিলাম না তখন দুর্নাম করিয়াই বা বিখ্যাত কেন হইব না? এ-সব ছেলে মনে করে, 'সবাই দেখুক, আমি কি করিতে পারি!'—নিজেকে জাহির করার উপায় হইতেছে গুণ্ডামি। এই মনোবৃত্তি 'ইন্‌ফিরিয়রিটি

কম্প্লেক্স্’ হইতে আসে—অবশ্য উন্টা ভাবে। অর্থাৎ ইহারা ভিতরে ভিতরে টের পায় যে ইহাদের কোথাও কোনো স্থান নাই। সেই অভাব পূরণ করার সম্ভাবনা সদুপায়ে নাই, সুতরাং সমাজবিরুদ্ধ কাজ করিয়াই বুঝাইয়া দেওয়া যাক্—‘আমি কম নই’। স্কুল-কলেজের ‘অসভ্য’ ছেলেদের বেশির ভাগই লেখাপড়াতে খারাপ। গ্লুয়েক্স্ (Gluecks) প্রায় এক হাজার বদ ছেলেমেয়ে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, শতকরা ৮৪টিই লেখাপড়াতে খারাপ। ইহারা বিদ্যালয় হইতে পলায়ন বা মাস্টার মশায়দের সঙ্গে ঝগড়া ইত্যাদিতে অভ্যস্ত। গুণ্ডামি ভিন্ন অন্য কোনও রাস্তাতে ইহারা আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না বলিয়াই ঐ রকম কাজ করিয়া থাকে।

একটি বিশেষ লক্ষ্য করিবার ব্যাপার এই যে, বদ ছেলেরা প্রায়ই দলবদ্ধ থাকে এবং অপরাধও দলবদ্ধ হইয়া করে। ইহাদের গুপ্ত বৈঠক বসে কোনও গাছতলায় বা ভাঙা বাড়ির ভিতর। সেখানে আলোচনা হয়, কী প্রোগ্রাম অনুসরণ করিতে হইবে! এই রকম ছেলেদের ভিতর একতা খুবই থাকে, একজন অপর জনকে সব সময়ই রক্ষা করে। লোক জোগাড় করার ভঙ্গীও কৌশলপূর্ণ। গলির মোড়ে শিস্ দিতেই একটি ছেলে নামিয়া আসিল, পরে আরও আসিল। ইহাদের সাঙ্কেতিক ভাষা থাকে, যাহা বুঝিবার জো নাই। আর একটি সর্দারও থাকে যাহাকে সব সময়েই দলের সকলে মানিয়া চলে। পাড়ার লোকেরা ইহাদের অনেক সময়ে ভয় করিয়া চলে—তাহাতে ইহাদের আত্মতৃপ্তি। বেনামা চিঠি লেখা, হুমকি দেওয়া, মেয়েদের প্রতি অশ্লীল আচরণ প্রভৃতি ইহাদের অভ্যাস।

বদ ছেলেদের অপরাধ নয় বা দশ বৎসরের পূর্বে দেখা যায় না। ইহা হইতেই বোঝা যায় যে শৈশবে এই সমস্যার সমাধান করা উচিত।

অনেকে বলেন ‘অভাবে স্বভাব নষ্ট’, সুতরাং যে সব ছেলেপিলে

অর্থকষ্ট পায় তাহারাই বিপথে যায়। কিন্তু এ কথা কি সত্য যে, গরিব হইলেই ছেলেরা চুরি করে? কত লক্ষপতির ছেলেমেয়েরা চুরি করে তাহা শিক্ষক মাত্রই জানেন। আমাদের দেশে দারিদ্র্য সত্ত্বেও চাষীর ছেলেপিলেরা খুব কমই চোর হয়। হিলি (Healy) দেখিয়াছেন যে, ৮২৩টি ছেলেপিলেদের ভিতর মাত্র ৪টি ক্ষেত্রে দারিদ্র্য সোজাসুজি কারণ। সে যাহা হউক, ইহাও স্বীকার করিবার উপায় নাই যে, দারিদ্র্যের জন্য ভালো শিক্ষার সুযোগ মেলে না, হয়তো কুপল্লীতে থাকিয়া ছেলেপিলেরা নষ্ট হইয়া যায়। তাহা ছাড়া, গরিব বাপ-মা সব সময়ই খাটিতেছে, ছেলেমেয়ের দিকে নজর দিবার তাহাদের অবকাশ নাই। অভিভাবকদের অবহেলাতে ছেলেমেয়েরা যা-খুশি তাই করিয়া বেড়ায় এবং ক্রমশ বিপথে যায়। গরিবের ছেলেমেয়েরা ভাল বই পায় না, দেশভ্রমণ বা নানা রকম শিক্ষা লাভের সুযোগ তাহারা পায় না। অতএব, বলিতে পারি যে গরিব বলিয়াই কেহ চোর হইবে এমন নয়, তবে গরিব হইলে শিক্ষা ও সুপরিচালনার অভাবে অনেক শিশু নষ্ট হইয়া যায়। দারিদ্র্য সত্ত্বেও সুপরিচালনায় ও সুশিক্ষায় ছেলে খুব ভালো হইতে পারে, তাহার দৃষ্টান্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি।

পারিবারিক প্রভাব লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, শিশুর নৈতিক চরিত্র মা-বাপ ভাই-বোন ইত্যাদির প্রভাবে গড়িয়া উঠে। গ্লুয়েক্স্ (Gluecks) দেখিয়াছেন যে, প্রায় শতকরা নব্বই স্থানেই বদ ছেলেদের আত্মীয়রা কেহ-না-কেহ কয়েদী ছিল। যাঁহারা এই সমস্যা লইয়া গবেষণা করিয়াছেন তাঁহারা সবাই দেখিয়াছেন যে পরিবার খারাপ হইলে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হয় যে শিশুমন বিকৃত হইয়া পড়ে। বাপ-মায়ের ভিতর যদি দিনরাত ঝগড়া চলিতে থাকে বা বাড়িতে চিত্তাকর্ষক কিছু না থাকে তবেই শিশুরা বাহিরে থাকিতে চাহে এবং অসৎসঙ্গে মিশিবার সুযোগ পায়। শিশুকে যদি কেহ স্নেহ করিবার না থাকে তবে শিশু

নিশ্চয়ই পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করিবে এবং হয়তো কুসঙ্গে পড়িবে। আবার অনেক সময় দেখা যায় যে অতিরিক্ত আদরে ছেলে খারাপ হইয়া যায়। কোনও শাসন বাড়িতে নাই; যাহা চায় খোকাবাবু তাহাই পায়, খোকাবাবু যাহা করে তাহাই ভাল, খোকাবাবুকে ধমকাইতে অভিভাবকেরা ভয় পান, পাছে খোকাবাবু কষ্ট পায় বা কাঁদিয়া আকুল হয়। শেষে এমন অবস্থা হয় যে মায়ের আঁচল হইতে চাবি খুলিয়া টাকা লইয়া যায়, বাধা দিলে বলে 'টাকা না পেলে সুইসাইড করব'—খোকাবাবুর অমূল্য জীবন রক্ষার জন্য সবাই সব-কিছু মানিয়া লইতে প্রস্তুত। এইভাবে গুণ্ডার সৃষ্টি হয়।

এ-সব বদ ছেলেকে 'ভালো' করিবার জন্য অনেক প্রতিষ্ঠান পৃথিবীর সভ্য দেশে রহিয়াছে। আমরা 'গুণ্ডা' 'পাজী' 'বদ্‌মায়েস' বলিয়া ছাড়িয়া দিলেই বা ঘা দুইয়েক লাগাইলেই তো সমস্যার সমাধান হইবে না। হতভাগ্যদের জীবনের মোড় ফিরাইয়া দিতে হইবে—সমাজের তাহারা যেন কল্যাণ করিতে পারে তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। এক রকম প্রতিষ্ঠান আছে (Borstal Institution) যেখানে এ রকম ছেলেদের একসঙ্গে রাখিয়া সুশিক্ষার বন্দোবস্ত করা হয়। তাহাতে অনেক সময় উপকার হয়।

এই সব ছেলের জন্য আলাদা বিচারালয় (Juvenile Court) থাকা উচিত। মনোবিদগণ বিচারের ভার লইবেন। কোথায় কাহাকে পাঠাইতে হইবে বা বাড়িতে অভিভাবকদের কি করিতে হইবে এ সমস্ত তাঁহারা ঠিক করিয়া দিবেন। মনে রাখিতে হইবে 'বদ ছেলে' সাধারণ ছেলেরই মতো, সে কোনও বিশিষ্ট জীব নয় (যা লম্ব্রসো বলেন), শুধু শৈশবের পরিচালনার দোষেই এমন হইয়াছে। আর বংশানুক্রমিকত্বও এমন ভয়ঙ্কর কিছু নয়। চোরের ছেলে জন্মিয়াই চোর হয় না। যদি ঐ ছেলেকে অন্য বাড়িতে বা অন্য প্রতিষ্ঠানে রাখা যায়, সে নিশ্চয়ই চোর

হইবে না। কুঅভ্যাস বা বদ্মায়েসি দুরারোগ্য ব্যাধি নয়, ইহা শুধু সঙ্গ-দোষ ও কুশিক্ষার ফল। ছেলেমেয়েরা যদি দেখে কাকাবাবু একটি প্রকাণ্ড রুই মাছ চুরি করিয়া বাড়ি ঢুকিলেন, বাবা কোনও হতভাগ্য অফিসের বাবুর পকেট হইতে তাঁহার মাসিক বেতনটি চুপিচুপি তুলিয়া আনিলেন, মা নিকটস্থ মহিলা-একজিবিশন হইতে দু-গাছি সোনার বালা লইয়া ফিরিলেন, তাহা হইলে বেচারাদের নিকট হইতে আমরা আর অন্য কি আশা করিতে পারি? বদ ছেলে বদ পরিবারেই বেশি হয় এবং পারিবারিক আবহাওয়া ভাল করিলে ছেলে সৎপথে যাইতে পারে এ কথা আমরা বিনাদ্বিধায় বলিতে পারি। অভিভাবকদের এই কথা মনে রাখিয়া নিজেদের দোষ সামলাইতে হইবে। ছেলেপিলেকে শুধু তীব্র প্রহার করিয়া ভাল করা যায় না, নিজেদেরও ভাল হইতে হইবে। পরিবারের ভিতর বাদ-বিসংবাদ বা অন্য কোনও অশ্লীলতা থাকিলে তাহা দূর করিতে হইবে। ছেলেদের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া দিলেই চলিবে না। বাপ-মার দায়িত্ব খুব বেশি। আর শিশু পরি-চালনার প্রণালী প্রতি পরিবারেই গুরুজনদের ভালভাবে জানা উচিত।

বর্তমানে মনোবিদগণ অপরাধী বা বদ-ছেলেদের মানসিক রোগগ্রস্ত বলিয়া মনে করেন। তাহাদের পুনরায় ঠিকপথে আনিবার জন্য এবং মনের বিকৃত অবস্থা পরিবর্তনের জন্য শিশু-পরিচালনাগার (Child Guidance Clinic) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহাতে ছেলেদের পর্যবেক্ষণ করা হয়, তাহাদের মন বিশ্লেষণ করিয়া মনোবিকারের কারণ অন্বেষণ করা হয়, তারপর অভিভাবকদের কর্তব্য বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া হয়। এই ক্লিনিকগুলি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ইহাতে কত ছেলে যে উপকৃত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। তোতলামি, পিছিয়ে-পড়া, অস্থিরতা, অপরাধপ্রবণতা ইত্যাদি শিশুমনের সর্বপ্রকার সমস্যা সমাধানের চেষ্টা এইসব ক্লিনিকে করা হয়। ভারতবর্ষে ইহার বিশেষ অভাব।

শিশু-পরিচালনার মূল সূত্র

পূর্বের আলোচনার পর আমাদের মনে স্বতই এ প্রশ্নের উদয় হয়, কি করিয়া শিশুমনের স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে হইবে? কি প্রণালীতে শিশুদের তত্ত্বাবধান করিলে তাহারা বিপথগামী না হইয়া পূর্ণব্যক্তিত্ব গঠন করিতে পারিবে? বাংলাদেশে এ সমস্যা লইয়া খুব বেশি চিন্তা করিতে আমরা এখনও শিখি নাই। কি শিক্ষিত, কি অশিক্ষিত, সবাই আপন খেয়ালমতো শিশুদের চালনা করি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারণ করিয়াও অনেক মহিলা সন্তান-পরিচালনায় এমন মূর্খতার পরিচয় দেন যে, দেখিয়া স্তম্ভিত হইতে হয়। যাহারা দেশের ভবিষ্যৎ তাহারা আমাদের দোষে পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারে না, ফলে আমাদের জাতীয় চরিত্র অতি নিম্নস্তরে থাকিয়া যায়। অনেকে বলেন, 'আমরা গরিব দেশের লোক, শিশু-শিক্ষার সুযোগ দেওয়া আমাদের সম্ভব নয়'; উত্তরে বলা যাইতে পারে, শিশু-পরিচালনার জন্য লাখ লাখ টাকা বা সোনা-রূপার দরকার হয় না, শুধু বাপ-মা, শিক্ষক ও সমাজের লোকেরা যদি একটু যত্ন এবং ধৈর্যসহকারে শিশুকে সাহায্য করেন, তবেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। ইহার জন্য চাই শিশুর প্রতি দরদ, দায়িত্বজ্ঞান, সহিষ্ণুতা এবং আদর্শবাদ। পৃথিবীতে যাঁহারা চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন, তাঁহারা অনেকেই গরিবের কুটীরে জন্মিয়াছিলেন। পয়সা-কড়ি যাঁহাদের আছে, তাঁহারাই যে শিশু-পরিচালনায় উৎসাহ দেখান এমন নয়। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু তাঁহার আত্ম-জীবনচরিতে বলিয়াছেন, ভারতবর্ষে বড়লোকের ছেলে হইয়া জন্মানো সৌভাগ্য না হইয়া দুর্ভাগ্যও হইতে পারে। অর্থাৎ আমাদের দেশের লোকেদের আর্থিক অবস্থা যত ভাল, ছেলেপিলে আদর পাইয়া তত অপদার্থ হওয়ার সুযোগ পায়।

শিশুকে জন্মদান করিয়া তাহাকে যদি আমরা যথাযথ শিক্ষা দিতে না পারি তবে তাহা বড়ই দুঃখের বিষয়। সুপরিচালনার অভাবে শিশুরা

অনেক সময়ে নষ্ট হইয়া যায় এবং বড় হইয়া সমাজ ও জাতির সর্বনাশ করে। পরিবারের দায়িত্ব এই ব্যাপারে খুবই বেশি। অভিভাবকদের কর্তব্য শিশুর মন বুঝিয়া তাহাকে চালানো। দুর্ভাগ্যবশত দেশের সর্বত্র যে সব 'হীরের টুকরো'র নমুনা পাওয়া যায় তাহাতে সন্দেহ হয়, আমরা আমাদের কর্তব্য করিতেছি কি? পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতির লোকেরা কি ভাবে শিশু-পরিচালনা করে এবং তাহাদের সন্তানরা কিরূপে গড়িয়া উঠে, তাহা আমাদের একবার চোখ মেলিয়া দেখা উচিত। আমরা এখনও সেই মনুস্মৃতি অনুসরণ করিতেছি: 'লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি, দশবর্ষাণি তাড়য়েৎ'। অর্থাৎ প্রথম কয়েক বছর আদর দিয়া মাথায় তোল, তারপর যখন ছেলেপিলে বেয়াড়া হইয়া উঠিবে, তখন চাবকাইয়া নামাও। কিন্তু অধুনা মনোবিদ্যা বলিতেছে যে, শিশুর মন প্রথম পাঁচ বছরেই গড়িয়া উঠে, ঐ সময়ে কঠোরতার সহিত তাহার শিক্ষায় যত্নবান হইতে হইবে, কোলে তুলিয়া নাচানাচি করিলে, সোনার বালা পরাইলে বা প্রচুর পরিমাণে মিষ্টি খাওয়াইলে চলিবে না। শিশুর জন্মের পর হইতেই তাহার শিক্ষা আরম্ভ হইল, তাহার পরিচালনার দায়িত্ব তখন হইতেই লইতে হইবে, ভবিষ্যতের জন্য তুলিয়া রাখিলে চলিবে না।

এখন আমরা কতকগুলি অত্যাবশ্যক শিশু-পরিচালনার নীতি আলোচনা করিব।

খাওয়াদাওয়া

বাঙালী-পরিবারে শিশুকে প্রায়ই ভোজনবিলাসী করিয়া তোলা হয়। খাওয়ার কোনও আইন-কানুন নাই, ডাক্তারের পরামর্শের ধার কেহই ধারেন না। এইমাত্র শিশু খাইয়া উঠিয়াছে, মামাবাবু খাইতে বসিয়া তাহাকে সঙ্গে লইয়া খাওয়াইলেন। তারপর একবার মা'র সঙ্গে, একবার ঠাকুমা'র সঙ্গে সারাদিন ধরিয়া এই পর্ব চলিতে থাকে। এই

রকম লোভী ছেলে পৃথিবীর অন্য দেশে কোথাও দেখা যায় না। ইহা আমাদেরই দোষ। আমরা কোনও নির্দিষ্ট সময়ে শিশুকে খাইতে দিই না, আদর করিয়া ডাকিয়া পাতে খাওয়াই—ঐ বেচারার কি দোষ? আমরা যদি প্রথম হইতে তাহার আহার নিয়ন্ত্রিত করি, তবে নিশ্চয়ই শিশু প্রত্যেকের সঙ্গে খাইবার জন্য লুব্ধ হইয়া উঠিবে না। আর একটি মজা এই—এ দেশে শিশুর আহার ও বড়দের আহার বিভিন্ন নয়। মাংস পায়েস বাটি বাটি শিশুও খাইতেছে, তাহার বাবাও খাইতেছেন,—একই প্রণালীতে দুষ্পাচ্য করিয়া উভয়ের জন্য রাঁধা হইয়াছে। অনেকে খাদ্যদ্রব্য ঘুষ দিয়া শিশুকে শান্ত করেন। শিশু কাঁদিতেছে, মা দুটি রসগোল্লা কিনিয়া তাহাকে দিলেন। মন্ত্রবৎ কাজ হইল, শিশু চুপ। কিন্তু যেইমাত্র সেই নশ্বর রসগোল্লা ফুরাইল, পুনরায় শিশু আরও কিছু পাইবার লোভে কাঁদিয়া উঠিল। এইভাবে শিশু কান্নাকাটি অভ্যাস করিয়া লয়, কারণ তাহাতে লাভ অনেক। ক্রমশ একটি 'কাঁদুনে' এবং পেটুক বঙ্গসন্তান চন্দ্রকলার ন্যায় বাড়িয়া উঠে।

আমাদের আর একটি জাতীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, আমরা ছেলেপিলেদের প্রতি ভালবাসা দেখাই তাহাদের খাওয়াইয়া। কাকাবাবু, মামাবাবু ইত্যাদির আগমনের অর্থই প্রচুর মিষ্টি বা দই-ক্ষীর মিলিবে। অনেক মা-বাবা আছেন যাঁহাদের সন্তানদের কিছু খাইতে না দিলে তাঁহারা বিরক্ত হন এবং বলেন, "যত আদর শুধু শুধু মুখে মুখেই।" খুব উচ্চশিক্ষিত পরিবারেও এই মনোভাব দেখা যায়। কোন প্রিয়জন বা বন্ধুবান্ধব আসিলেই শিশুরা কাঙালের মত খাদ্যলোলুপ হইয়া তাকাইয়া থাকে। ইহারা কোনও দিন আর লোভ সামলাইতে শিখিবে না। এই কু-অভ্যাসবশত আমাদের দেশের যুবক, প্রৌঢ় আর বৃদ্ধেরাও ভোজন-বিলাসী হইয়া পড়েন এবং রোগজীর্ণ দেহ লইয়া কোনও প্রকারে বাঁচিয়া থাকেন।

খাওয়া সম্বন্ধে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করার উদ্দেশ্য হইতেছে এই যে, অতিরিক্ত ও অনিয়ন্ত্রিত আহারে শুধু শরীর খারাপ হয় না, মনেরও বিশেষ ক্ষতি হয়। যদি শিশু সর্বদাই 'কি খাব, কি খাব' ভাবে, তবে তাহার মনের উৎকর্ষ হইবে কি করিয়া? লোভ সংযত না হইলে মন উচ্চতর বিষয়ে নিবিষ্ট হইবে না,—মানসিক ক্ষমতাগুলি অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইয়া যাইবে। খাওয়ার লোভে পড়িয়া বহু ছেলে চুরি করিতে এবং মিছা কথা বলিতে শিখে, পরে ক্রমশ অধঃপাতে যাইতে থাকে। বাঙালীরা বড় হইয়াও খাওয়া সম্বন্ধে অত্যন্ত ছেলেমানুষির পরিচয় দেয়। নিমন্ত্রণে কে কত লুচি খাইল, একটি পাঁঠা কে খাইতে পারে, বৃহদাকার কাঁঠাল কে কয়টি খাইতে অভ্যস্ত, ইত্যাদি আমাদের খুব মুখরোচক গল্পের বিষয়। আর পাতে বসাইয়া 'খাও বাবা, খাও' বলিয়া জবরদস্তি করিয়া খাওয়াইয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করি। ইহার যে কি পরিণাম তাহা আজও অনেকে ভাবিতে শিখেন নাই। দুর্বল শরীর ও তদপেক্ষা দুর্বল মন লইয়া বাঙালীর ছেলেরা জগতের অন্যান্য জাতির কাছে হাস্যাস্পদ হইয়া দাঁড়ায়। প্রথম হইতেই শিশুদের খাওয়াদাওয়া বিষয়ে ডাক্তারদের পরামর্শমতো কাজ করা উচিত। নির্দিষ্ট সময়ে আবশ্যক পরিমাণে তাহাকে খাওয়াইতে এবং সংযম অভ্যাস করাইতে হইবে। তাহাদের দৃষ্টি যেন এই সকল ক্ষুদ্র বিষয়ে আবদ্ধ না থাকিয়া বৃহত্তর বিষয়ে আকৃষ্ট হয়।

শিষ্টাচার

আদব-কায়দা, ভদ্রতা ইত্যাদি ছেলেবেলা হইতেই শিখাইতে হইবে। অনেকে ভাবেন, ছেলেপিলে বড় হইলে নিজেরাই 'ভদ্র' বনিয়া যাইবে। তাহারা কোন্‌টা শিষ্টতা, কোন্‌টা অশিষ্টতা কিছুই জানে না। যাহা দেখে তাহাই শিখে। বাবু চাকরকে গালাগালি দিলেন, শিশু কৌতূহলের সহিত শুনিল। পরে সেই শব্দটি বাবার বা দাদার প্রতি

প্রয়োগ করিল। সবাই শিশুমুখের ভাঙা ভাঙা কথা শুনিয়া হাসিয়া অস্থির, যেন কতবড় তামাশা। এই অদূরদর্শী অভিভাবকেরা জানেন না যে, এরূপ করিলে ভবিষ্যতে ছেলে সভ্যতা-ভব্যতা কোন জন্মেও শিখিবে না। আদব-কায়দা ইত্যাদি ভাল করিয়া শিখাইতে হইবে। অনেক সময় শিশুরা অবাধ্যতা করিবে, তখন শাস্তি দিয়াও ভদ্র ব্যবহার শিখানো আবশ্যক। আমাদের দেশের লোকেদের শিষ্টাচারজ্ঞান কম বলিয়া কুখ্যাতি আছে, তাহার কারণ আর কিছুই নয়, ছেলেবেলাতে শিষ্টাচার যত্নসহকারে শিখানো হয় নাই। সভা-সমিতিতে হট্টগোল লাগিয়াই আছে, বক্তা বলিয়া যাইতেছেন, আমরা আপন মনে গল্প করিয়া যাইতেছি। সাধারণ ভদ্রতার বিন্দুমাত্র জ্ঞান দেখা যায় না। মজার ব্যাপার এই যে এডুকেশন কনফারেন্সে শিক্ষাব্রতীরা নিজেরাও এই অশোভন দৃষ্টান্ত দেখান। আমাদের দেশে দু-চারজন লোক একসঙ্গে একটা আলোচনা করিতে গেলেই তুমুল গোলমালের সৃষ্টি করে। একজন কথা বলিলে যে চুপ করিয়া আগে তাহার কথা শুনিতে হয়, এ সৌজন্য-জ্ঞান খুব কম লোকেরই আছে। এক সঙ্গে সবাই তারস্বরে কথা বলে, কেহই কাহারও কথা শোনে না। আচ্ছা, ছেলেবেলায় স্কুলে বা গৃহে কি করিয়া আলোচনা করিতে হয়, বা সভা-সমিতিতে কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, তাহা কি শিক্ষা দেওয়া হয়? ভদ্রলোক ভুঁইফোড় হইয়া জন্মে না, ভদ্রলোক তৈয়ার করিতে হয়। এম. এ., বি. এ. পাস করিয়াও যে আমরা সৌজন্যের অভাব দেখাই, তাহার কারণ শৈশবে যত্নসহকারে ঐ বিষয়ে শিক্ষা আমাদের দেওয়া হয় না।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকিতেও শৈশবে শিখাইতে হইবে। একবার নোংরামি অভ্যাস লইয়া গেলে, তাহা মুছিয়া ফেলা কঠিন। ইউরোপীয়দের ঘরবাড়ি কত পরিষ্কার! উহাদের ছেলেপিলেরা কত পরিচ্ছন্ন! অনেকে

বলেন, উহারা বড়লোক, আমরা গরিব, তাই পারিয়া উঠি না। ইহা কি ঠিক? পয়সা থাকিলে কিছু বেশি জামা কাপড় আসবাবপত্র কেনা যায়, কিন্তু তাহাতেই পরিচ্ছন্নতা আসে না। কত গরিব লোকের বাড়িঘর সুন্দর। আবার বড়লোকের বাড়িঘর এলোমেলো। গরিব সাঁওতালদের ঘরবাড়ি, বাসন-পত্র দেখিয়া চক্ষু জুড়ায়; গরিব জাপানীদের ঘরবাড়িও পরিপাটী। আমরা ছেলেবেলায় পরিচ্ছন্নতা অভ্যাস করাইব না, শুধু কর্তব্য এড়াইবার জন্য বলিব 'ও টাকা ছাড়া হয় না, স্টেটের সাহায্য ছাড়া হয় না।' শিক্ষিত উচ্চপদস্থ বাঙালীরা যেখানে সেখানে থুথু এবং পানের পিক্ ফেলেন, তাঁহাদের বাড়িতে ডাস্টবিনের ব্যবহার নাই, আসবাবপত্র যেখানে সেখানে ছড়ানো থাকে, ধুলায় ধূসরিত হইয়া বাসনপত্র পড়িয়া থাকে—ঐসব বাড়ির শিশুরা কি করিয়া 'পরিচ্ছন্নতা' শিখিবে? নিজেরা পরিষ্কার থাকিয়া প্রত্যেক জিনিস যথাস্থানে রাখিয়া উহাদেরও ঐরূপ করিতে শিখাইতে হইবে। প্রত্যহ মুখ ধোয়া, জুতা পরিষ্কার, ঘর-বাড়িতে ধুলা বা মাকড়সা থাকিলে তাহা পরিষ্কার করা, ছেলেমেয়েদের এ সকল অভ্যাস করানো কঠিন নহে, অথচ একান্ত প্রয়োজনীয়। উহাদের সৌন্দর্যজ্ঞান জাগাইয়া তুলিতে হইবে। সেজন্য গোড়ায় একটু কঠোর হইতে হইলেও উপায় নাই। বাঙালী-বাড়িতে শিশু অপরিষ্কার থাকিলে বা কোনও জিনিস অপরিষ্কার করিলে বড় জোর দুই-একবার ধমক খাইতে হয়। আর শিশুরা যখন দেখে, বড়রাও ঐ দোষে দোষী, তখন তাহাদের মনে আসে আলস্য বা শৈথিল্য। এমনি করিয়া অপরিষ্কার থাকার স্বভাব তাহাদের বদ্ধমূল হইয়া যায়। ফলত আমাদের স্কুল, কলেজ, হোস্টেল, বাড়ি-ঘর প্রায় কুৎসিত। শৈশব হইতে পরিচ্ছন্নতা না শিখাইলে পরে আর অভ্যাস করানো যায় না। কদর্যভাবে থাকার অভ্যাস কেবল নিজের নহে, প্রতিবেশিদের পক্ষেও অনিষ্টকর—এ জ্ঞান আমাদের নাই।

জাতীয় চরিত্র উন্নত করিতে হইলে এই কু-অভ্যাস দূর করিতেই হইবে।

স্বাবলম্বন

আমাদের দেশের ছেলেদের আদর দিয়া অনেক সময়ে অকর্মণ্য করিয়া তোলা হয়। ছেলে আপন মনে খেলিতেছে; ঠাকুমা দিদিমা বা পাড়ার পাতানো সম্পর্কের মাসীমা আসিয়া জোর করিয়া ছেলেকে কোলে তুলিবেন—ভাল বাসেন যে। সক্ষম ছেলেকে স্নান করাইয়া, কাপড় পরাইয়া কি অদ্ভুত আত্মতৃপ্তি! ছেলেরা নিজেরা কাজ করুক, ইহা আমরা শিখাইতে চাই না। নিজেদের ভাববিলাসিতাকে তৃপ্ত করিবার জন্য উহাদের কাজ করিয়া দিই। 'মা' 'মা' করিয়া করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেই মা মাসী পিসী বাহিনী মার্চ করিয়া আসেন, কি করিবেন ঠিক পান না। অনেক বাড়িতে শিশুকে কখনও কোল হইতে নামানো হয় না, মাটিতে বসাইলে নাকি বংশের মর্যাদা হানি হয়। সর্বদা কোলে রাখিতে রাখিতে ছেলেমেয়েরাও পাইয়া বসে, পায়ে আর হাঁটিতে চায় না এবং অত্যন্ত পরনির্ভরশীল হইয়া পড়ে। ইহাতে স্বাস্থ্যের হানি হয়, আর মন হয় দুর্বল। বাড়িতে অত্যধিক আদরে এবং নিজের কাজ নিজে না করিতে শিখায় বাঙালী ছেলে পরে 'ঘরমুখো' হয়। কোনও প্রতিষ্ঠান নিজে গড়িয়া তোলা বা স্বাবলম্বী হইয়া দুঃখকষ্ট সহ্য করিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য করা —ইত্যাদিতে তাহার কোনও উৎসাহ থাকে না। অত ঝামেলায় কি দরকার! কেরানী-গিরির রাজপথ উন্মুক্ত আছে তো! মায়ের-আঁচলে-বাঁধা ছেলেদের আর কি হইতে পারে?

বর্তমান মনোবিদ্যা বলিতেছে, শৈশবে ছেলের যে মনোবৃত্তি গঠিত হইবে, তাহাই পরবর্তী কালে তাহার চরিত্রের ভিত্তি হইবে। মায়ের আঁচলে-বাঁধা আদুরে বাঙালীর ছেলে মা-দিদিমার উপর নির্ভরশীল, উহার বিন্দুমাত্র কষ্ট হইলে তাঁহারা দৌড়াইয়া আসেন—ফলত কষ্ট-

সহিষ্ণু হওয়া তাহার পক্ষে সম্ভব নয়। স্বাবলম্বী হইতে দেওয়া হয় না বলিয়াই সে স্বাবলম্বী হয় না। বেচারা নোট পড়িয়া বা প্রাইভেট টিচার রাখিয়া বড় জোর পাস করিয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহার দৌড় ঐ পর্যন্তই। কারণ মাসীদের অতিরিক্ত আদরে শিশুর মনের গভীরতম প্রদেশে যে পরনির্ভরশীলতা এবং অসহায়তা বোধ ঢুকিয়াছে, তাহা সারা জীবন ধরিয়া চলিবে এবং সর্বপ্রকার বৃহৎকর্মের পরিপন্থী হইয়া দাঁড়াইবে। ফ্রয়েড্ প্রভৃতি বর্তমান মনোবিদ্গণের ইহাই অভিমত।

ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, আমাদের গৃহের আবেষ্টনই অনেক সময়ে সন্তানগণের উন্নতি-সম্ভাবনার সমাধি রচনা করে। উচ্চাকাঙ্ক্ষা আমাদেরও নাই এবং ছেলেপিলেরা বড় হউক ইহা আমরা সর্বান্তঃকরণে চাহি না। পূজা-পার্বণে ছেলে বাড়ি আসিবে, চাকুরি করিবে, বেশ ভাল ঘরে অর্থাৎ ইম্পিরিয়াল বা প্রভিন্সিয়াল গ্রেডের চাকুরের মেয়েকে বাড়ির বউ করিবে এবং এই প্রকারে 'সুখে' থাকিবে —বাস্। বাপ-মায়ের বোঝা উচিত যে, ছেলেমেয়ে আমাদের খেলার সামগ্রী নয়, তাহাদের ভাল কিসে হয়, কিসে তাহারা পূর্ণব্যক্তিত্ব গঠন করিয়া দেশ ও সমাজকে উন্নত করিতে পারে, স্বাবলম্বী হইতে পারে, তাহাই আমাদের শিক্ষা দেওয়া উচিত। বাড়িতে বসিয়া 'মা' 'মা' 'বাবা' 'বাবা' মন্ত্র জপ করিলে;চিরকালের জন্য তাহারা 'খোকাবাবু' বা 'খুকিমণি' থাকিয়া যাইবে। বাড়িতে অতিরিক্ত দাস-দাসী থাকাও এক ভয়ের কারণ। ছেলেমেয়ে তাহাতে অত্যন্ত আরামপ্রিয় হইয়া যায়। সুতরাং দেখা উচিত যেন শিশু যথাসাধ্য তাহার নিজের কাজ নিজেই করে। স্নান করা, কাপড়-জামা পরা, খাওয়া-দাওয়া, বই-পত্র গুছানো, কাপড়-চোপড় পরিষ্কার—ইত্যাদি সব নিজে করিবে। দাস-দাসী যেন তাহা না করে। অনেক বাড়ির ছেলেমেয়েদের সঙ্গে দরোয়ান বা চাকর স্কুলে যায় তাহাদের বই বহন করিয়া। মা সরস্বতী এই প্রকারের

শিষ্য-শিষ্যাদের কি চোখে দেখেন জানি না, তবে মনে হয়, যাহারা বইয়ের 'বোঝা' বহন করিতে পারে না, তাহারা মিছামিছি কেন উহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করার চেষ্টা করে? পল্লীগ্রামে কত ছেলে মাইলের পর মাইল হাঁটিয়া স্কুলে আসে, হাজার হাজার ছেলেমেয়ে (যাহাদের চাকর নাই) নিজেরাই বই লইয়া ক্লাসে আসে। কিন্তু এই ধরনের ছেলেমেয়েদের কেন এমন অলস ও পঙ্গু করিয়া রাখা হয়?

সময়ানুবর্ত্তিতা ও সত্যবাদিতা

সময়ানুবর্তিতা ও সত্যবাদিতাও গৃহে শৈশবের শিক্ষার বিষয়। নেহাৎ মেল ট্রেন আমাদের কেয়ার না করিয়া চলিয়া যায়, তাই আমরা ট্রেনের সময় মানিয়া চলি, কিন্তু তাহা ছাড়া সর্বদাই লেট্ হই। কেহ-বা মীটিং কি থিয়েটার শেষ হইবার পূর্বে বিন্দুমাত্র লজ্জার চিহ্নও না দেখাইয়া প্রবেশ করেন। যদি অল্প বয়স হইতে আমরা ছেলেদের নির্দিষ্ট সময় মানিয়া চলার অভ্যাস করাই এবং নিজেরাও মানিয়া চলি, তবে নিশ্চয়ই এ বদ অভ্যাস দূর হয়। মুখে মুখে লেকচার দিয়া কিছু হয় না, কারণ শৈশব হইতে যদি তাহারা দেখে যে অভিভাবকের সময় রাখিতে যত্নবান নন, তাহা হইলে নিজেরাও কোন গরজ অনুভব করে না। সেই যে সময় সম্বন্ধে একটা গাফিলতি আসিয়া যায় তাহা মনের নিভৃত কোণে থাকিয়া যায় এবং কখনও দূর হয় না। একটি ইংরেজ ছেলে জানে নির্দিষ্ট সময়ে বাড়ি না পৌছিলে তাহার খাবার মিলিবে না, হাজার কান্নাকাটি করিলেও না। তাই সে সময় রাখিতে বাধ্য হয়। সময়ানুবর্তিতা সম্বন্ধে পৃথিবীর অন্য সর্বত্র কড়াকড়ি নিয়ম, কেবল আমাদের দেশ ছাড়া। দুপুরের নিমন্ত্রণ খাইতে কেহ বিকালে, কেহ-বা সন্ধ্যায়ও আসেন। কাজেই সে সমাজে শিশুদেরই বা সময় রাখিবার গরজ থাকিবে কেন?

আমরা ছেলেপিলেদের ধমকাই—'বল্, শিগগির সত্যি কথা বল্';

কিন্তু নিজেরা কি করি? বাহিরে কেহ ডাকিতেছে, বাবা ছেলেকে বলিলেন 'যা বল্‌গে, আমি বাড়ি নেই।' ছেলে কাঁদিয়া অস্থির। কিছুতেই তাহাকে শান্ত করা যায় না, কাকাবাবু বলিলেন 'বাবা, চুপ কর্, আপিস-ফেরত কাল তোকে হুইসেল কিনে দেব'। কিন্তু কত কাল চলিয়া গেল, সেই প্রতিজ্ঞা আর কাকাবাবু রাখেন নাই। মিথ্যা আশা দিয়া, মিথ্যা কথা বলাইয়া, আমাদের নিজেদের মিথ্যা ব্যবহার দ্বারা শিশুর নৈতিক চরিত্র আমরা ভাঙিয়া দিই। বড় হইয়া তাহারা হাজার তীর্থ-ভ্রমণ করিয়া, দর্শন পড়িয়া বা ধর্মগ্রন্থ আলোচনা করিয়াও মনোবৃত্তি বদলাইতে পারে না। উদাহরণ খুঁজিতে দূরে যাইতে হয় না। উচ্চশিক্ষিত ভদ্রলোকেরাও 'কাল আপনার ওখানে আসব' বলিয়া আর আসেন না; 'যথাসম্ভব সাহায্য করব' বলিয়া করেন না। মিথ্যা আমাদের মনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। বৈদেশিকেরা আমাদের কথা বিশ্বাস করে না, আমরাও আমাদের কথা বিশ্বাস করি না। জাতীয় চরিত্র এতই দুর্বল যে, আমরা যাহা করিতে চাই তাহাতেই আমাদের ভণ্ডামি প্রকাশ পায়। ইহার কারণ, শৈশবে কি গৃহে কি বিদ্যালয়ে সত্য পালনের শিক্ষা পাই না। আমরা জানি যে, মিথ্যা কথা সবাই বলে এবং দরকার হইলে আমরাও বলিতে পারি, শুধু ধরা যেন না পড়ি। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার গবেষণাতে দেখাইয়াছিলাম যে, শিশুরা নৈতিক আদর্শ মা-বাবা হইতে শিখে। তাই মা-বাবা নিজেরা সত্যবাদী হইয়া যদি বাল্যে আমাদের সত্যবাদিতা শিখান, তবেই জাতীয় চরিত্র উন্নত হইতে পারে।

শাস্তির প্রণালী

অনেকে আধুনিক মনোবিদ্যার উপদেশ ভুল বুঝিয়া থাকেন—ভাবেন যে, শিশুদিগকে সব সময়ই যাহা-ইচ্ছা তাহাই করিতে দিতে হইবে। ঐ প্রকারে ছেলেপিলেদের ছাড়িয়া দিলে তাহারা অদ্ভুত জীব হইয়া

উঠিবে এবং সমাজের শৃঙ্খলা ও সভ্যতার আদর্শ তিরোহিত হইবে। 'যে যাহা খুশি তাই করিবে' বলার অর্থ জঙ্গলের অধিবাসীদের অনুসরণ করা। শিশুর ইচ্ছা কখনও তাহাকে ধ্বংসের দিকে লইয়া যাইতে পারে, তখন অবশ্য তাহাকে দমন করিতে হইবে। শাস্তি দেওয়ার প্রয়োজন যে-কোনও সময় হইতে পারে। শারীরিক শাস্তিরও দরকার মাঝে মাঝে হইতে পারে। যখন শাস্তির প্রয়োজন তখন শাস্তি না দেওয়াতে শিশুর প্রতি অবিচার করা হয়।

শিশু বারে বারে পরের বাড়ির একটি ছেলেকে মারিতেছে এবং খুব তৃপ্তির সহিত হাসিতেছে। তখন তাহাকে এমন শাস্তি দিতে হইবে যেন অসহায় ছেলেটিকে মারিয়া সে যে আনন্দ পাইতেছিল, তাহার অপেক্ষা অনেক বেশি কষ্ট পায়। অনেক ছেলের চিমটি কাটার অভ্যাস, তখন যদি তাহাকে বড় আকারের একটি চিমটি কাটা যায় তবে বদ অভ্যাস দূর হয়। যখন সে বুঝিবে যে, পরকে মার-পিট্ করা মোটেই স্ফূর্তির ব্যাপার নয়, তখনই ঠাণ্ডা হইবে। অনেকে ধমক দেন 'মেরে হাড় গুঁড়ো ক'রে দেব', কিন্তু কখনও তা করেন না, এবং শিশুও জানে তাহা করা সম্ভব হইবে না। তখন সে শাস্তির হুমকিকে মোটেই গ্রাহ্য করিবে না। অভিভাবকদের এ বিষয়টা ভাল করিয়া স্মরণ রাখা উচিত। যদি শাস্তি না দেন, দিবেন না। কিন্তু হুমকি দেখাইবেন অথচ কার্যত কিছুই করিবেন না—এ বড় অন্যায়। ইহাতে শিশু শাসনের উপর আস্থা রাখিবে না এবং অভিভাবককে ভয় না করিয়া দুর্দান্ত হইবে।

অপরাধ করা মাত্রই শাস্তি দেওয়া উচিত। 'আচ্ছা, আবার করলে পিঠে লাঠি ভাঙব' এই রকম না বলিয়া তৎক্ষণাৎ যথোচিত শাস্তি দেওয়া উচিত। তাহা না হইলে শিশু ক্রমাগত অপরাধ করিতে থাকিবে এবং পরে তাহাকে দমন করা কঠিন হইবে। আর শাস্তি যেন দোষানুযায়ী

হয়। সামান্য দোষে গুরুতর শাস্তি দিলে শিশু মনে মনে অভিভাবককে অশ্রদ্ধা করিবে এবং পরে বেয়াড়া হইয়া যাইবে। অপরাধ করিলে প্রথমে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে হইবে, কি ধরনের অপরাধ করিয়াছে। শিশুকে এক গ্লাস জল আনিতে বলিলাম। সে গ্লাসটি ভাঙিয়া ফেলিল। যদি শিশুর হাত হইতে হঠাৎ গ্লাসটি পড়িয়া গিয়া থাকে, তবে তাহাকে মারধোর করা অন্যায় হইবে। আর যদি শিশু নিজের অপরাধ বুঝিতে পারিয়া লজ্জিত হয়, তাহা হইলেও শাস্তি দেওয়া অনুচিত। উহাতে আঘাত পাইয়া তাহার মন বাঁকিয়া বসিবে। মনে রাখিতে হইবে শাস্তির উদ্দেশ্য প্রতিহিংসা গ্রহণ করা নয়, অনিষ্টমূলক কাজ হইতে শিশুকে বিরত করা। শাস্তির ফলে সে যেন নিজের অপরাধ বুঝিতে পারে এবং তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলে সে যেন ভবিষ্যতে আর এরূপ কাজ না করে। ইহা প্রকৃতপক্ষে শিশুর মঙ্গলের জন্য। অনেকে বাড়াবাড়ি করিয়া এমন মারধোর করেন, মনে হয় চোর বা ডাকাত শায়েস্তা করিতেছেন। ইহাতে শিশুর মন অত্যন্ত আঘাত পায় এবং শাস্তির ফল ব্যর্থ হয়। শিশু ভাবে 'বড় হইয়া শোধ তুলিব।' বেশি মার খাইয়া শিশুরা বেয়াড়া হইয়া যায় এবং আর কখনও শাস্তির ভয় করে না এবং অভিভাবককে মনে মনে ঘৃণা করে এবং পরে নিজেরা হিংস্রপ্রবৃত্তির বশীভূত হয়।

শারীরিক শাস্তি যথাসাধ্য কম দেওয়া উচিত। নেহাৎ প্রয়োজন না হইলে উহা দেওয়া ঠিক নয়। আর সবাই ঐ শাস্তি দিবার উপযুক্ত নয়। নিজে রাগিয়া গেলে তাহার শাস্তি দিবার অধিকার নাই, কারণ উন্মত্ত অবস্থায় হয়তো শাস্তির পরিমাণ বেশি হইয়া যাইবে।

মানসিক শাস্তি বহু স্থলে কার্যকরী হয়। উহার প্রয়োগে অনেক সমস্যার সমাধান হইতে পারে। খাইতে না দেওয়া একটি মূল্যবান অস্ত্র। ইহাতে মারধোরের মত দানবীয় ভাব নাই, অথচ ফল হয়

চমৎকার। না খাইলে চলিবে না, সুতরাং শিশু বাধ্য হইয়া কথা শোনে এবং অপরাধ হইতে বিরত হয়। তবে অনেক মা-মাসী ইহা করিতে পারেন না, মুখে ভয় দেখান 'আজ ভাত পাবে না', কিন্তু শীঘ্রই 'বাছাদের' করুণ মুখ দেখিয়া বরং একটু বেশি যত্ন করিয়াই খাওয়ান। একটু যদি ধৈর্য ধরিয়া থাকিতেন, তবেই উহার সুফল দেখিতে পাইতেন। আর একটি ভাল উপায় বয়কট করা। অর্থাৎ বাড়িতে কেহই তাহার সহিত কথা বলিবে না। ইহাতে শিশু জব্দ হয়, কারণ কেহ কথা না বলিলে সে অত্যন্ত অসহায় বোধ করে। শীঘ্রই অনুতপ্ত হইয়া আর অপরাধ করিবে না বলিয়া সে প্রতিজ্ঞা করিবে। কিন্তু মুশকিল এই যে, পরিবারের সবাই একভাবে কাজ করেন না। মা হয়তো বলিলেন 'ভাত পাবে না', জ্যেঠিমা তৎক্ষণাৎ জেদ করিয়া পায়েস খাওয়াইয়া দিলেন। শিশু বুঝিল, শাস্তির ভয় নাই। দুই-একজন শিশুর সঙ্গে কথা বলিল না, আবার তিন-চারজন দৌড়াইয়া গিয়া শিশুকে আদর করিতে লাগিল এবং তাহার সঙ্গে গল্প জুড়িয়া দিল। পরিবারের সকলে একমত হইয়া শাস্তি না দিলে কোনই অর্থ হইবে না। ছেলেপিলেদের কথা দ্বারা লজ্জা দিলেও খুব সুফল হয়। যেমন, ছেলে পড়ার সময় গোলমাল করিতেছে। তখন তাহাকে যদি বলা যায়—'এ, ছি! তোমার মত ভাল ছেলে এমন করবে, তা তো ভাবি নি'। শিশুদের আত্মসম্মানে ঘা দিলে তাহারা খুব লজ্জিত হয় এবং অপরাধ হইতে বিরত হয়।

একটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে, যেন শাস্তি দিবার পর আর শিশুর অপরাধ লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি করা না হয়। অপরাধ শাস্তি অনুশোচনা; তারপরই সদ্ভাব পুনঃস্থাপিত হওয়া উচিত। আবার হাসি-খুশি হইয়া শিশু যখন আসিবে তখনই তাহার সহিত মিশিতে হইবে যেন কিছুই হয় নাই। অনেকে শিশু অনুতপ্ত হওয়ার পরও ঘ্যান্ঘ্যান প্যান্প্যান করিয়া শিশুকে উত্ত্যক্ত করেন, ফলে তাহারা চটিয়া বলিয়া বসে 'বেশ

করেছি, আরও করব'। গোলমাল মিটিয়া গেলেই আর সে বিষয়ে কথা বলা উচিত নয়, বরং প্রফুল্লচিত্তে শিশুর সঙ্গে ভাল ব্যবহার করা কর্তব্য।

যৌন-শিক্ষা

শিশুরা মোটেই তথাকথিত 'নির্দোষ' নয়। তাহাদের যৌন-ঔৎসুক্য যথেষ্ট পরিমাণে আছে। অনেক সময় আসিয়া মাকে প্রশ্ন করে 'মা, আমি কি করিয়া হইয়াছি?' নরনারীর যৌনজ্ঞান সম্পর্কে অনেক প্রশ্নই তাহাদের শিশুমনে জাগে। এখন তাহারা মা-বাবার কাছে উত্তর চাহিতে আসে। কিন্তু আমাদের সংস্কারবশত আমরা শিশুকে ধমকাইয়া দিই। কিন্তু ইহাতে শিশুর ঔৎসুক্য না কমিয়া বরং বাড়িবে এবং অভিভাবকের নিকট ধমক খাইয়া পাড়ার ছেলের কাছে উত্তর শুনিতে যাইবে; ফলে হয়তো খারাপ ছেলের সঙ্গে মিশিবে, কারণ তাহাদের কাছে অনেক মজার মজার কথা শোনা যাইতে পারে।

আমরা এক পরম সঙ্কটে পড়িয়াছি। একদিকে বুঝিতে পারি যে 'ঢাক ঢাক, চুপ চুপ' নীতি ভাল নয়, আবার লজ্জা আসিয়া বাধা দেয়। ছেলেপিলেরা পঞ্জিকা ও খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন হইতে কত কি মাথামুণ্ড পড়িয়া কাল্পনিক ভয়ে আড়ষ্ট হইতেছে, কত কি ভুল জিনিস শিখিতেছে, কত বাজে বখাটে ছেলেদের নিকট আদি-রসাত্মক গল্প শুনিতেছে—তাহা দেখিয়া শুনিয়াও কি আমরা নিশ্চেষ্ট থাকিব? যৌন-শিক্ষা না হইলে পরে অত্যন্ত গুরুতর ক্ষতি হইতে পারে। যৌন-ব্যাপারে অজ্ঞতাও ভাল নয়, ভবিষ্যৎ জীবনে তাহাতে সমূহ বিপদ হইতে পারে, বিবাহিত জীবন ব্যর্থ হইতে পারে। ফ্রয়েডের কথাতে অন্তত এইটুকু সত্য নিহিত আছে যে, যৌনপ্রবৃত্তির যথাযথ সুপরিচালনা না হইলে ব্যক্তিত্বের পূর্ণবিকাশ হয় না এবং মনের বিকার উপস্থিত হইতে পারে। অতিরিক্ত যৌন-ঔৎসুক্য এবং উৎসাহ যেমন শিশুর মনকে বিচলিত

করিয়া তাহার উৎকর্ষে বাধা দেয়, তেমন ইচ্ছাকৃত অজ্ঞতাও মনকে অস্বাভাবিক করিয়া অগ্রগতিতে বাধা দেয়।

শিশুদিগকে সুচিন্তিত প্রণালীতে যৌন-শিক্ষা দিতে হইবে এবং শিক্ষা দিবেন বাবা-মা বা অন্য কোনও অভিভাবক, যাঁহার উপর শিশুর শ্রদ্ধা আছে। শিশু যদি তাহার প্রশ্নের উত্তর বাড়িতেই পায়, তবে আর বখাটে ছেলেদের কাছে যাইবে না। শিশুর যে কোন যৌনসমস্যা আসিবে, যদি তাহার মা-বাবা বা অন্য কেহ সমাধান করিয়া দেন তবে সে কৃতজ্ঞ থাকিবে এবং তাহার মন বিচলিত হইবে না। বর্তমানে আমরা এ বিষয় তুচ্ছ করাতে শিশুর মন বিকৃতভাবে আত্মপ্রকাশ করে। স্কুল-কলেজের পাইখানাতে, দেয়ালে, বেঞ্চিতে, পাবলিক পার্কে যে সব অশ্লীলতার পরিচয় পাওয়া যায় তাহাতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, শিশুদের যৌন-শিক্ষা দেওয়া হয় নাই।

বাপ-মার কখনও ছেলেপিলেদের সঙ্গে এক বিছানায় শোওয়া উচিত নয়। এক বছর বয়স হইলেই শিশুকে আলাদা শোয়ানো উচিত, কারণ, তাহার মনে অকালেই যৌন-ঔৎসুক্য জন্মিতে পারে। এ বিষয়ে আমাদের অনেকেরই কোনও চৈতন্য নাই। এই বিছানায় পাঁচ ছয় বছরের শিশুদের লইয়া ও বাবা-মা শয়ন করেন। ইহা অত্যন্ত গর্হিত।

খেলা-ধুলা, লেখাপড়া, বেড়ানো, অভিনয়—নানাপ্রকার কাজে শিশুকে মত্ত রাখিতে হয়, তাহা হইলে সে যৌন-দুশ্চিন্তা হইতে মুক্তি পায় এবং উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে। কোনও কাজকর্ম না থাকিলেই ছেলে-মেয়েরা চিন্তা করে। এমন ভাবে শিশুকে পরিচালনা করিতে হইবে যেন তাহার যৌনপ্রবৃত্তি নিম্নাভিমুখী না হইয়া নানাপ্রকার উচ্চতর কাজে নিয়োজিত হয় (Sublimation)। শিশুরা যদি ঠিকমতো যৌনশিক্ষা পায় তাহা হইলে অযথা তাহারা উহা লইয়া মাথা ঘামাইবে না, অন্য

কাজে মনোযোগ দিবে ; কিন্তু যদি বাধা পায়, তবেই খারাপ পথ ধরিতে পারে।

শিশুদের যৌনশিক্ষা ধাপে ধাপে দিতে হইবে। যে যেমন তাহাকে সেই ভাবে শিখাইতে হইবে। বয়স, বুদ্ধি, ঔৎসুক্য অনুসারে শিক্ষার পদ্ধতি ঠিক করিতে হইবে। মিথ্যা কথা একেবারে বর্জন করা উচিত, কারণ শিশু তাহা ধরিয়া ফেলে। আর একটি কথা মনে রাখা উচিত, শিশু প্রশ্ন করার পূর্বেই তাহাকে প্রয়োজনীয় তথ্য বলিয়া দেওয়া ভালো। তাহা হইলে অভিভাবকের প্রতি তাহার আস্থা বাড়িয়া যায় এবং দুশ্চিন্তা কমিয়া যায়। শিশুকে যৌন-শিক্ষা দেওয়ার সময় শিক্ষক নিজে অবিচলিত হইয়া লজ্জা না করিয়া সহজ ভাবে তথ্য বুঝাইয়া দিবেন। শিশু যদি কোন অবৈধ আচরণ প্রকাশ করে, তবে তাহাকে শাস্তি না দিয়া সহানুভূতির সহিত আত্মসংযমে সহায়তা করিতে হইবে। ইহাও মা-বাবাই ভাল করিতে পারেন। তাঁহারাই সন্তানের সর্বাপেক্ষা বড় বন্ধু এবং সন্তান বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া তাহাদের সাহায্য পাইলে চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকিবে। অযথা ভয় দেখানো অত্যন্ত অন্যায়, তাহাতে অনেক ছেলেপিলের মনের রোগ হয়, তাহারা বিমর্ষ হইয়া থাকে এবং আত্মবিশ্বাস নষ্ট হইয়া যায়।

ছেলেপিলের মন যেন যৌন-ব্যাপারটিকে স্বাভাবিক দৃষ্টিতে দেখে, তাহাদের মন যেন বিচলিত না হয় এবং অশ্লীলতার দিকে না যাইয়া নানাবিধ কল্যাণ কর্মে ব্যাপৃত থাকে। বর্তমানে সিনেমা শিশুর মনের পক্ষে অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর প্রভাব বিস্তার করিতেছে। হয় শিশুদের জন্য আলাদা সিনেমা হউক, নয়তো তাহারা যেন এ সিনেমা না দেখে। অকালপরিপক্কতা ছেলেদের মধ্যে সিনেমার দৌলতেই হইয়াছে। অনেক অভিভাবক যে কোন ফিল্মে ছেলেমেয়েদের লইয়া যান বা তাহারা কি ফিল্ম দেখে না-দেখে তাহার কোনও খোঁজখবর

রাখেন না। দুর্ভাগ্যবশত বর্তমানে আমাদের দেশের চলচ্চিত্র 'লভ', মোটরগাড়ি, স্যুট, কাল্পনিক পল্লীগ্রাম ইত্যাদি কতকগুলি উদ্ভট জিনিসে ভরপূর—তাহাতে ছেলেমেয়েদের মনে ব্যক্তিত্বগঠনের কোনও উপকরণই থাকে না, বরং অকালে শিশুর মনে অস্বাস্থ্যকর কৌতূহল জন্মে। বর্তমানে মেয়েদের নাচের স্কুল অলিতে গলিতে হইয়াছে। সুরুচিসম্পন্ন নৃত্য নিশ্চয়ই সৌন্দর্যানুভূতি আনিয়া দেয়, মনের উৎকর্ষলাভে সহায়তা করে। কিন্তু অনেক নাচের বিষয় শিশুদের পক্ষে অহিতকর—রাধাকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় নৃত্য আদিরসাত্মক এবং ছেলেমেয়েদের ভিতর তাহার প্রবর্তন করা অন্যায়। তাহাদের জন্য নির্দোষ সরল সহজ নৃত্যশিক্ষার বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে।

বাঙালী-সমাজে বিবাহের সময় কতকগুলি স্ত্রী-আচার আছে, যাহা ছেলেমেয়ে সবার সামনেই পালন করা হয়। খুব সুরুচির পরিচয় যে অনেকগুলি প্রথাতে নাই তাহা সবাই জানেন। এমন ঠাট্টা ইয়ারকি করা হয় যাহা অশ্লীল এবং ছেলেপিলেদের সামনে ঐ অভিনয় অতি-আধুনিক শিক্ষিত পরিবারেও চলে। শিশুরা ঐ সব দেখিয়া অত্যন্ত কৌতূহল প্রকাশ করে। অর্ধেক বুঝিয়া এবং অর্ধেক না বুঝিয়া তাহারা বিচলিত হয়, এবং পাড়ার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আলোচনা করিয়া 'পাকামি' শিখে। যৌন শিক্ষার পক্ষে ইহা মস্ত এক বাধা। শিশুদের সামনে বড়দের খুব সংযত থাকিতে হইবে। বর্ষীয়সী মহিলাদের গুপ্ত আলোচনায় যেন ছেলেমেয়েরা উপস্থিত না থাকে, তাহারা 'বোকা' নয়। আমরা শিশুকে অশ্লীলতা হইতে মুক্ত রাখিব। তাহার মনে কোন দ্বিধা থাকিবে না, অসঙ্কোচে সে মা-বাবার কাছে তাহার সমস্যা ব্যক্ত করিবে। আমরা বৈজ্ঞানিক মনোভাব লইয়া তাহার সমাধান করিব, তাহাকে সাহায্য করিব এবং প্রয়োজনানুসারে যৌন-শিক্ষা দিব। কত ছেলে যে একটুমাত্র পরিচালনার অভাবে কুসঙ্গে মিশিয়া ভয়ঙ্কর ব্যাধিতে

আক্রান্ত হয়, নিজের জীবন ছারখার করিয়া ফেলে, তাহার হিসাব কে রাখে? মা বাবা যদি এ বিষয়ে যত্নবান হন, তবে অনেক বিপদ হইতে সন্তান বাঁচিয়া যাইবে। যৌন-শিক্ষা দিতে তাঁহাদের এত লজ্জাই বা হইবে কেন? আর সত্য অস্বীকার করিয়া কি লাভ? শিশুর মনে যৌন-কৌতূহল হইবেই, উপযুক্ত ব্যক্তিরা তাহাকে পরিচালনা না করিলে বাজে বখাটে ছেলে, ঝি-চাকর তাহাদের শিক্ষক হইবে। কোন্‌টা ভাল সহজেই অনুমেয়।

বিশেষ ক্ষমতা

সব ছেলেমেয়ে কখনও সমান নয়। এক এক জনের মানসিক শক্তি এক এক দিকে বেশি পরিস্ফুট হয়। কেহ লেখাপড়ায়, কেহ গান-বাজনায়, শিল্প-কলায়, কেহ কলকব্জার কাজে অন্য সকলের অপেক্ষা বেশি কৃতিত্ব অর্জন করে। মনোবিদগণ দেখিয়াছেন, শৈশব হইতেই শিশুদের বিশেষ ক্ষমতা টের পাওয়া যায়। কোন কোন ছেলে একটি টিনের চাকতি, পুরানো ঘড়ির স্প্রিং, ভাঙা সাইকেল ইত্যাদি লইয়া কত কি তৈয়ার করে! আবার অন্য কেহ ছেলেবেলা হইতেই বই লইয়া মত্ত থাকে। কেহ গানের প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পায়, কেহ-বা ছবি আঁকাতে প্রতিভার পরিচয় দেয়। আশ্চর্য ব্যাপার এই, অল্পবুদ্ধি ছেলেদেরও কোন-না-কোন দিকে কিঞ্চিৎ পটুত্ব থাকে। যেমন সুযোগ না পাইলে প্রতিভার বিকাশ হয় না, তেমনি ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, সবার ভিতর সব রকম প্রতিভা থাকে না এবং সবার সব কিছু হয় না।

আমাদের বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করা উচিত শিশুদের কোন্ দিকে প্রতিভা আছে। বর্তমানে মনোবিদগণ অনেক পরীক্ষা করিয়া ঠিক করিতে পারেন, কাহার কোন্ দিকে বিশেষ ক্ষমতা আছে। কোনও বাবা-মা ভাবিয়া রাখিয়াছেন, ছেলেকে ডেপুটি করিতে হইবে; কিন্তু

প্রকৃত পক্ষে সেই বেচারার মানসিক শক্তি যা আছে তাহাতে তাহার টিকেট-কালেক্টার হওয়াই মানায়। এখানে বৃথা তাহাকে গঞ্জনা দিয়া, প্রাইভেট টিউটারকে টাকা খাওয়াইয়া বা মাস্টার মহাশয় ও ইউনিভার্সিটিকে অযথা গালাগালি দিয়া কি লাভ? যাহার ভিতর কলকজার কাজের প্রতি অনুরাগ ও ক্ষমতা আছে তাহাকে সেই লাইনের জন্য তৈয়ার করিতে হইবে। প্রত্যেক ছাত্রেরই তাহার বিশিষ্ট ক্ষমতানুযায়ী পেশা গ্রহণ করার জন্য তৈয়ারি হওয়া উচিত। যার কর্ম তারে সাজে, অন্যলোকের লাঠি বাজে—কথাটি মিথ্যা নয়। সন্তানদের সম্বন্ধে অভিভাবকদের কত ভুল ধারণা থাকে, তাহার ইয়ত্তা নাই। ফলে অনেকে মনঃকষ্টে দিন কাটান এবং ছেলেদের জীবনটিও মাটি হয়। ছেলেদের কাহার বিশেষ ক্ষমতা কোন্ দিকে এবং কে কি হইবে, এই সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা রাখিলে ভাল হয়।

অনেক ছেলেকে জিজ্ঞাসা করা হইল 'তুমি আই. এ. পড়িবে, কি আই. এস-সি. পড়িবে?' উত্তর হইলঃ 'আজ্ঞে, মামাবাবু জানেন।' উহারা কিছুই দৃঢ়ভাবে করিতে চাহে না। উহাদের অভিভাবক যাহা বলিবে তাহাই করিবে। কিন্তু সবার কি সব হয়? অনেক ডাক্তার চাহেন, ছেলে ডাক্তার হইবে। কিন্তু ছেলের বিশেষ প্রতিভা রহিয়াছে গান-বাজনার দিকে। তাহার উপরে জোর করিলে ফল হইবে মেডিকেল কলেজের কর্তৃপক্ষের মস্তিষ্কবিকার। যে সব লোক তাহাদের পছন্দসই কাজকর্ম করিবার সুযোগ পায় না, তাহাদের মনে কখনও শান্তি থাকে না এবং শক্তির অপচয় অত্যন্ত বেশি হয়। ইহা বর্তমানে আমাদের দেশের সর্বত্রই দেখা যায়। যাঁহার হওয়া উচিত ছিল এন্‌জিনীয়ার তিনি হন হোমিওপ্যাথ্ এবং গলির মোড়ে 'গ্রেট্ ইস্টার্ন এশিয়াটিক হোমিও হল' স্থাপন করিয়া পান দোক্তা চা সিগারেট তাস পাশার অনুরাগীদের স্বর্গ রচনা করেন। ইহার জন্য দায়ী তাঁহার অভিভাবক। শিশুকাল

হইতে বিশেষ প্রতিভা লক্ষ্য করিয়া যে যে বৃত্তির উপযুক্ত, তাহাকে সেই দিকে চালনা করিতে হইবে, নতুবা বিপর্যয় উপস্থিত হইবে।

শিশু-পরিচালনায় পরিবারের কর্তব্য

বাবা-মার মনে রাখিতে হইবে, শিশু তাঁহাদের অতিথি, কিছু সময়ের জন্য সে তাঁহাদের সঙ্গে থাকিবে। সুপরিচালনার দ্বারা তাহার ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুট করিয়া তাহাকে সমাজের কল্যাণের জন্য, দেশের মঙ্গলের জন্য ছাড়িয়া দিতে হইবে। শিশুর ভবিষ্যৎ কর্মক্ষেত্র বৃহত্তর জগৎ—ক্ষুদ্র পরিবার নয়। মায়ের আঁচল-বাঁধা হইয়া থাকিলে চলিবে না, শিশুকে 'ঘরমুখো' করিয়া রাখিলে চলিবে না। বাবা-মার বুঝিতে হইবে যে, ছেলেকে ভালবাসিতে হইবে ছেলের ভালর জন্য, প্রকৃত মনুষ্যত্বলাভে সহায়তার জন্য,—আত্মতৃপ্তির জন্য নয়। বর্তমানে আমাদের দেশে অভিভাবকেরা চান ছেলে লেখাপড়া শিখিয়া চাকুরি করিবে, কিন্তু তাহাকে সমস্ত ব্যাপারেই পরিবারের মতানুসারে চলিতে হইবে। কত সাহিত্য পড়িল, রবীন্দ্রনাথের কবিতা মুখস্থ করিল, কিন্তু ঐ পর্যন্তই। পরিবারের গতানুগতিক রীতিনীতি সবকিছুই তাহাকে মানিয়া লইতে হইবে। ব্যক্তিত্বের গঠন বাঙালী মা-বাবা চান না, তাঁহারা চান 'আমাদের খোকা চিরকাল খোকা'ই থাকিবে। প্রত্যেক শিশুর ভিতরে উচ্চ আদর্শ স্থাপন করিতে হইবে ছেলেবেলা হইতেই। বিদ্যার ভাণ্ডারে, জ্ঞানের ভাণ্ডারে যেন সে কিছু দিতে পারে, দেশের ও দশের সে যেন কিছু ভাল করিতে পারে, এমন অনুপ্রেরণা শৈশব হইতে দিতে হইবে। শৈশবের এই শিক্ষা পর্বতের মতো দৃঢ় হইয়া তাহাকে ভাবী জীবনে রক্ষা করিবে।

গৃহ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কম নয়। শিশু এইখানেই প্রথম আবির্ভূত হয় এবং তাহার প্রথম শিক্ষা এইখানেই হয়। ঠিকমতো শিক্ষা-দীক্ষা পরিচালনা না হইলে গৃহ তাহার মানসিক জীবনের সমাধিক্ষেত্র হইয়া

দাঁড়াইবে। আজ আমাদের দেশকে গঠন করিয়া বিশ্বসভায় সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। ইহা কঠিন কার্য এবং এই কার্যের গোড়াপত্তন করিতে হইবে ঘরে ঘরে শিশুদের লইয়া। বাবা মা যদি এই কাজে সাহায্য না করেন, তবে বাঙালী 'বাঙালী'ই থাকিয়া যাইবে। বাংলাদেশের মেয়েদের শিশু-পরিচালনার বিদ্যা ভাল করিয়া আয়ত্ত করিতে হইবে। তাঁহাদের উপরই সন্তানের ভবিষ্যৎ প্রধানত নির্ভর করে। রাষ্ট্রের সাহায্য প্রয়োজন সন্দেহ নাই। তথাপি আমাদের যেটুক্ ক্ষমতা তাহার প্রয়োগে যেন আমরা আলস্য না করি। মানুষ তৈয়ারির শিল্পালয়ে পরিবারের স্থান খুবই উচ্চে। আমরা সেই দিনের অপেক্ষায় আছি, যে দিন দেখিব বাঙালী শিশুরা জগতের শিশু-সমাজে দয়ার পাত্র নয়, পরিহাসের পাত্র নয়, পরন্তু আদর্শস্থানীয়।

॥ ১৩৫০ ॥

১. সাহিত্যের স্বরূপ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২. কুটিরশিল্প : শ্রীরাজশেখর বসু
৩. ভারতের সংস্কৃতি : শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী
৪. বাংলার ব্রত : শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৫. জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার : শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
৬. মায়াবাদ : মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ
৭. ভারতের খনিজ : শ্রীরাজশেখর বসু
৮. বিশ্বের উপাদান : শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
৯. হিন্দু রসায়নী বিদ্যা : আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়
১০. নক্ষত্র-পরিচয় : অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত
১১. শারীরবৃত্ত : ডক্টর রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল
১২. প্রাচীন [illegible] বাঙালী : ডক্টর সুকুমার সেন
১৩. [illegible] পক শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়
১[illegible] [illegible]য়ুর্বেদ-পরিচয় : মহামহো[illegible]য় গণনাথ সেন
[illegible] বঙ্গীয় নাট্যশালা : শ্রীব্রজেন্দ্রনা[illegible]ন্দ্যোপাধ্যায়
[illegible]৬. রঞ্জন-দ্রব্য : ডক্টর দুঃখহরণ চক্রব[illegible]
১৭. জমি ও চাষ : ডক্টর সত্যপ্রসাদ রা[illegible]চৌধুরী
১৮. যুদ্ধোত্তর বাংলার কৃষি-শিল্প : ডক্টর [illegible]হম্মদ কুদরত-এ-খুদা

॥ ১৩৫১ ॥

[illegible] রায়তের কথা : শ্রীপ্রমথ চৌ[illegible]
[illegible] জমির মালিক : শ্রীঅত[illegible]
২১. [illegible] চাষী : [illegible] বসু
২২. বা[illegible]র : ডক্টর শচীন সেন
২৩. আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা : অধ্যাপক শ্রীঅনাথনাথ বসু
২৪. দর্শনের রূপ ও অভিব্যক্তি : শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য
২৫. বেদান্ত-দর্শন : ডক্টর রমা চৌধুরী
২৬. যোগ-পরিচয় : ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার
২৭. রসায়নের ব্যবহার : ডক্টর সর্বাণীসহায় গুহ সরকার
২৮. রমনের আবিষ্কার : ডক্টর জগন্নাথ গুপ্ত
২৯. ভারতের বনজ : শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু
৩০. ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক ইতিহাস : রমেশচন্দ্র দত্ত
৩১. ধনবিজ্ঞান : অধ্যাপক শ্রীভবতোষ দত্ত
৩২. শিল্পকথা : শ্রীনন্দলাল বসু
৩৩. বাংলা সাময়িক সাহিত্য : শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৩৪. মেগাস্থেনীসের ভারত-বিবরণ : রজনীকান্ত গুহ
৩৫. বেতার : ডক্টর সতীশরঞ্জন খাস্তগীর
৩৬. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য : শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ